সৌভিক ভট্টাচার্যের

মার্ডার ইন এ মিনিট

রূপান্তর : ত্বাইরান আবির

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা
৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
facebook.com/projonmopublication
www.projonmo.pub

সৌভিক ভট্টাচার্যের

মার্ডার ইন এ মিনিট

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর ২০১৯

প্রচ্ছদ

ওয়াহিদ তুষার

পরিবেশক

আমাদেরবই ডট কম
২য় তলা, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৯৫৪ ০১৪ ৭২০

অনলাইন পরিবেশক

www.amaderboi.com/projonmo
www.rokomari.com/publisher/8485
www.boibazar.com/projonmo-publication

মূল্য : ৩০০ [তিনশত] টাকা

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; মার্জিন সলিউশন, ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Murder In A Minute by Shouvik Bhattacharya, Translated by Tayran Abir,
Published by Projonmo Publication
Copyright © Projonmo Publication
Price : 300 Taka
International Price : $18.00 USD
ISBN: 978-984-34-6697-6

প্রারম্ভ

জীবন নদীর অববাহিকায় কখনো কখনো অকল্পনীয় কিছু ঘটে যায় মানুষের জীবনে। সেই কল্পনাতীত সত্য নিয়ে মানুষ ভাবতে চায় না, তবু সেটা নিয়েই ভাবতে হয়। আর সেটাই একসময় জীবনের ভয়ানক স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায়। সেই সত্যের সামনে মানুষ কখনোই দাঁড়াতে চায় না। তবু নিষ্ঠুরতার সাক্ষী হয়ে প্রতিটি নিঃশ্বাসে তা স্মরণ করতে হয়। ইশা (এই গল্পের প্রধান চরিত্র) ঠিক তেমনই অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। জীবনের অপ্রিয় বাস্তবতার সাথে লড়াই করে যাচ্ছে সারাক্ষণ, কিন্তু পেরে উঠছে না কিছুতেই। কেমন হতো জীবনটা যদি এমন না হত? ভাবল সে। সাথে সাথে মনে হিংস্র একটা সত্যের কথা ভেসে আসলো- 'কি ভেবেছ? তুমি এই সত্যকে অস্বীকার করতে পারবে? না...কখনোই না।' কথাটা মনে করে রাগে শরীর কাঁপতে লাগল ইশার।

'তোমাকে এই বাস্তবতা মেনে নিতেই হবে। যত শীঘ্রই তা পারবে, তোমার জন্যই ভালো হবে।' কথাগুলো যে বলেছিল তার মুখাবয়ব চোখজুড়ে ভাসতে লাগল। হাড় হিম করা মুহূর্ত হারিয়ে গেল সময়ের স্রোতে।

অশ্বত্থ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা একটি দিনের কথা মনে পড়ল তার। ঐদিন তার এমন কিছু অনুভূতি হয়েছিল, যা আগে কখনো হয়নি। সেদিন অনুভূতির সাগরসম উচ্ছ্বাসে না ভেসে পারেনি সে। তাই অনুভূতিগুলো তার কাছে ভাসমান মেঘের মতো হয়। সবসময় এক রকম থাকে না। কিছু সময়ের জন্য হলেও প্রিয় মানুষের সাথে মধুর এক অনুভূতি ছিল তার। তবে, এই মধুর অনুভূতিই তার জীবনকে বিষিয়ে দিয়েছে, করেছে ছন্নছাড়া। অশ্বত্থ গাছটি আজো দণ্ডায়মান। জানালা থেকে কিছুটা দূরে। পশ্চিম আকাশে জমেছে ধূসর মেঘ। যেতে যেতে তা মিলিয়ে গেছে দূরের হিমালয় পাহাড়ে। সেই বর্ণিল মেঘ ফুঁড়ে এক দল বালি-হাঁস আকাশে কয়েকবার চক্কর দিয়ে উড়ে গেল দূর সীমানায়।

অরোরা ম্যানশন। অপরূপ সুন্দর এক বাড়ি। এ বাড়িতেই নিজের ব্যক্তিগত রুমে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ইশা। বাড়ির পাশেই একটা

স্কুল। বাড়ির উপরতলা থেকে তাকালে মাঠ দেখা যায়। সেখান থেকে আসা বাচ্চাদের চিৎকার চেঁচামেচি ইশার রুমটা ভরিয়ে তুলছে। সাদা ও নীল পোশাক পরা বাচ্চাগুলো ফুটবল নিয়ে ছোটাছুটি করছে। যার পায়ে বল যাচ্ছে, সে-ই লাথি মারছে। বিশৃঙ্খল অবস্থা। আদৌ এটাকে ফুটবল খেলা বলা যায় না, তবে উদ্দেশ্যহীনভাবে বলে লাথি মারাটাও এই ছোট বাচ্চাদের কাছে খুব আনন্দের। সেটা তাদের উচ্ছ্বল চেহারা দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

ইশা চা শেষ করে পেছনে ঘুরল। পড়ন্ত বিকেল। জানালা ভেদ করে আসা লালাভ সূর্যের আলোয় তার ক্লান্ত মুখশ্রী আলোকিত হয়ে উঠল। কিন্তু হঠাৎই কিছু একটার দিকে চোখ পরতেই সে ভয়ে কেঁপে উঠল। রুমের পরিবেশ গুমোট হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। চারদিকে কেমন যেন শূন্যতা। ইশার চোখেমুখে সতর্কতার আভাস। নির্মম এক সত্যের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে ও। জানালার পাশের টেবিলের উপর নীল রঙের একটা খাম। ভয় মেশানো চোখে খামটার দিকেই তাকিয়ে ইশা। বিকেলের দিকে যখন বোর্ড মিটিংয়ে আসা সদস্যদের নিজেদের মাঝে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল সে, তখন ব্যক্তিগত এক ডিটেকটিভ তাকে খামটি দিয়েছিল। বহুদিন ধরে অজানা এক অস্থিরতায় ভুগছে ইশা। নির্মম এক সত্য জানার জন্য। তার মনে বহু প্রশ্ন লুকিয়ে আছে। সেসব প্রশ্নের উত্তর রয়েছে এই খামের ভেতর। তাই উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল সে। ভয়ে ভয়ে খামটার দিকে এগোল। নাকটা এমনভাবে কাঁপছে যেন কোনো টাইম বোমার দিকে এগোচ্ছে সে। একেবারে কাছে এসে গেছে ঠিক তখনই প্রচণ্ড আওয়াজে দরজায় নক করার শব্দ শুনতে পেল। তাৎক্ষণিক ঘুরে দাঁড়াল। শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল দরজার দিকে। তারপর কাছে এগিয়ে গেল। খামটা আর খোলা হলো না। সেটা টেবিলেই পরে রইল।

দরজা খোলার সাথে সাথে ইশার মুখশ্রী লাল বর্ণ ধারণ করল। প্রচণ্ড রাগ হওয়া সত্ত্বেও অতিথিকে ভেতরে ঢুকতে দিল সে। রুমে পিনপতন নীরবতা। কেউ কোনো কথা বলছে না। তবে ইশার চেহারায় জিঘাংসার ভাব স্পষ্ট। এলমেলো চুলগুলো ঠিক করে নিল সে। রাগে বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছে যেন এক্ষুণি ঝগড়া শুরু হবে।

'আমি তাকে ইতোমধ্যেই সেই কথাগুলো বলেছি। তোমাকে সন্তুষ্ট করতে আমাকে আর কী কী করতে হবে?' চিৎকার করে উঠল ইশা।

কোনো জবাব এল না। দ্বিতীয়বারের মতো চুল ঠিক করতে লাগল সে। হাঁত কাপছে তার। তবে চেহারা থেকে রাগ সরে গেছে। সেখানে ভর করেছে অসহায়ত্ব। ফের জানালার কাছে যেতেই গোধুলীর আলো আঘাত করল তাকে।

'আমাকে আর কী কী করতে হবে বলো? আমি জানি এক সময়...' একটু থামল সে। গ্রীষ্মের রাতে গাছের পাতা ঝরার মতো ঠোঁট কাঁপতে লাগল তার। 'তুমি কি একটিবারের জন্যেও আমাকে বিশ্বাস করবে না?'

সমস্ত রুম জুড়ে নীরবতা। কাছাকাছি কোনো এক মন্দির থেকে ঘন্টির আওয়াজ ভেসে আসছে। রুমের ভেতর তাদের দুজনের চোখ নিবদ্ধ হয়ে আছে একে অপরের চোখে। দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইল দুজন। তারপর একে অপরের খুব কাছে এগিয়ে এল। এক জোড়া হাত ইশার কোমড় জড়িয়ে আলিঙ্গন করল তাকে। একবার বাধা দিতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু খানিকবাদেই কামনার জোয়ারে ভেসে গেল। জোরে নিঃশ্বাস পরছে দুজনের, একে অপরের খুব কাছে। ইচ্ছে শুধুই মিশে যাওয়ার অদ্ভুত এক মাদকতায়। আলতো হাত এবার খুলে নিল তার সোয়েটার। উত্তেজনায় চোখ বন্ধ হয়ে এল ইশার। অপর চোখজোড়ার মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলল সে। উন্মত্ত চুম্বনে সুখের নীলাভ সাগরে ভাসতে লাগল ইশা। অবশেষে মনে হলো শান্তি খুঁজে পেয়েছে ও।

আগন্তুক চলে গেল বেশিক্ষণ হয়নি। ইশা ফের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সুখের সময়টা নিয়ে ভাবছিল। হঠাৎ কারো পায়ের আওয়াজ ভেসে এল তার কানে। মনে হলো কেউ গুটিগুটি পায়ে তার কাছেই এগিয়ে আসছে। অজানা এক আতঙ্ক ভর করে বসল তার মনে। কে আসছে? ভয়ে ভয়ে পেছন ঘুরে তাকিয়ে দেখবে, অমনি কেউ একজন সজোরে তার মাথায় আঘাত করল। প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল ইশা। চিৎকার করতে চেষ্টা করল সাহায্যের জন্য, পারল না। শক্ত হাত চেপে ধরল তাকে। মুখে বালিশ গুঁজে দিয়ে চাপ দিল প্রচণ্ড শক্তিতে। ইশা শ্বাস নিতে চেষ্টা করল। সব ফুরিয়ে আসছে মনে হচ্ছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। খুব চেষ্টা করেও নিজেকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারল না। কতক্ষণ হাত পা ছোড়াছুড়ি করে চির আঁধারের জগতে হারিয়ে গেল ইশা।

অপরাধের ভয়াল থাবা

বিকেলবেলা। ঘড়িতে সময় পাঁচটা বেজে ত্রিশ মিনিট। পলমপুরে আঁধার নামতে শুরু করেছে। মনোরম পাহাড়ে ঘেরা ভারতের হিমাচল প্রদেশের একটা জায়গা এই পলমপুর। স্বভাবতই নীরবতায় ঘেরা। একমাত্র একটা বিষয় নিয়েই এখানে সবচেয়ে বেশি বাতচিত হয়। আর তা হলো 'ক্রিকেট'। তবে এই মুহূর্তে সেটাও হচ্ছে না। গুমোট পরিবেশ। বাতাস বইছে না। পাখি উড়ে চলেছে নিরুদ্দেশ। আকাশে মুহুর্মুহু আলোর ঝলকানিতে মনে হচ্ছে বৃষ্টি নামবে। অবস্থা এতটাই নীরব যে, কেউ হয়তো নিজের নিঃশ্বাস পর্যন্ত শুনতে পাবে।

অরোরা ম্যানশন। একতলা র‍্যাঞ্চ হাউস। আকারে বিশাল। লম্বা, নিচু ছাঁদ। কমলা রঙয়ের সাথে সাদা লেয়ারের দেওয়ালে স্ট্রিট লাইটের আলো পড়লে চকচক করে ওঠে। আরো আছে লম্বা রাউন্ড ওয়াকওয়ে। প্রতিদিনকার মতো আজো জগিং সেরে দুই ভাই রিশাভ ও আর্য বাড়ির বারান্দায় বসে আছে। আপন ভাই হলেও দুজনের চেহারার মাঝে ব্যাপক অমিল। দুই ভাইয়ের মাঝে রিশাভ বড়। ছ'ফুট লম্বা রিশাভ খুবই ফ্যাশনপ্রিয়। চুলগুলো কানের কাছ দিয়ে ছোট করে কাটা। উপরের চুলগুলো বেশ লম্বা এবং মোলায়েম। গাল জুড়ে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। ধূসর চোখ। তার শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গই যেন সুন্দর করে সাজিয়েছেন সৃষ্টিকর্তা। শক্তসামর্থ্য বুক, সরু ধড় এবং নাকটা চিকন ও লম্বা। অন্যদিকে আর্য ঠিক তার বিপরীত। তার ভাইয়ের থেকে পাঁচ ইঞ্চি খাটো সে। মোটাসোটা পেট ও গাল জানান দিচ্ছে কতটা সময় ঘরে বসে ভিডিও গেইম খেলে কাটায় আর্য। তবে মুখটা সুশ্রী। লম্বা, কোঁকড়ানো চুলগুলো চোখের নিচ পর্যন্ত বিদ্যমান।

'রি...রিশাভ দা।' একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল আর্য।

'তোমার কেন মনে হয় যে ফাস্ট বোলিং আমাদের ইন্ডিয়ানদের রক্তে নেই? অথচ আমাদের আছে কপিল দেব, জাভাগল শ্রীনাথের মতো খেলোয়াড়...'

আর্যের কথা শেষ করার আগেই রিশাভ বলে উঠল, 'বেশ, মেনে নিলাম। কিন্তু বর্তমান সময়ে জাতের একটা ফাস্ট বোলার তুই দেখাতে পারবি?'

হাত নেড়ে বলতে লাগল রিশাভ, আর্য চুপ করে রইল। রিশাভ ফের বলল, 'বর্তমান প্লেয়ারদের বোলিং ফিগার দেখেছিস? অস্ট্রেলিয়ার বাউন্সি পিচে ওদের পরিসংখ্যান খুব বাজে। জরুরি ভিত্তিতে এদিকে নজর দেওয়া উচিত ক্রিকেট বোর্ডের।'

ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ে শুরু হওয়া আলোচনা একসময় রূপ নিল বিতর্কে। বরাবরের মতোই আর্যর কোনো পয়েন্ট গুরুত্ব পেল না। রিশাভও ন্যূনতম হারতে রাজি না কোনো যুক্তিতে। এভাবে একসময় কথা শেষ হতেই দুই ভাই নিজ নিজ রুমের দিকে রওনা হলো।

ওদের বাড়ির কাজের লোক মীরা। লিভিংরুমের সোফায় হেলান দিয়ে টেলিভিশন দেখায় ব্যস্ত। হাতে কমলার জুসের প্যাকেট। চোখ টেলিভিশনে এতটাই নিবদ্ধ যে, জুসে চুমুক দেওয়ার সময় খানিকটা তরল যে তার গাল বেয়ে পরছে সেদিকে একটুও খেয়াল নেই। সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত। আচমকা কোথা থেকে সজোরে চিৎকার করার আওয়াজ ভেসে এল। এরপর মাটিতে ট্রে পরবার ঝনঝনাৎ আওয়াজ। স্তব্ধ করিডরে চিনামাটির ট্রে ভাঙচুরের আওয়াজ জোরেশোরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। আর্য আর রিশাভ তৎক্ষণাৎ নিজ রুম থেকে দৌড়ে এল। মেয়েলি কণ্ঠের বিলাপ শোনা যাচ্ছে। যন্ত্রণায় কেউ গোঙাতে থাকলে যেমন শোনায় ঠিক তেমন। বাড়ির ছোট কাজের মেয়ে জ্যোতি ইশার রুম থেকে দৌড়ে করিডরে থাকা আর্য আর রিশাভের কাছে ছুটে আসলো বিদ্যুৎ গতিতে। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার। চোখেমুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট। বড়বড় চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে এক্ষুণি ভয়াবহ কোনো ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে সে। মীরা চিন্তিত হয়ে দাঁড়িয়ে তার সামনে। জ্যোতির ভয়ের কারণ বুঝতে পারছে না। রিশাভও তার দিকে তাকিয়ে আছে। বুকটা রাবারের মতো ওঠানামা করছে তার। থেমে থেমে জ্যোতির বলা কথা রিশাভের সম্বিত ফেরাল।

'ইশা ম্যাম কোনো নড়াচড়া করছেন না।' বড় বড় শ্বাস নিয়ে বলল জ্যোতি। পরক্ষণেই আরো একটা চিৎকার শোনা গেল, মীরার চিৎকার। দুই ভাই দৌড়ে ইশার রুমে গেল। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল তারা। তারপর যা দেখল তাতে হতবাক হয়ে গেল দুজন। এমন কিছু তারা কখনো দেখেনি। এই পরিস্থিতি দেখতে হবে কস্মিনকালেও ভাবেনি। ইশার নিথর দেহ ফ্লোরের মাঝে পড়ে আছে। ভয়ানক নিস্তব্ধতা মিশে আছে তার চেহারায়, রক্তমাখা চোখটা খোলা। যেন ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। দেহের উপর পড়ে আছে হালকা সবুজ রঙের টেপ। রাস্তা থেকে আসা আলোতে ট্রাউজার উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। মাথার একপাশে মেখে আছে রক্ত।

রুমের বাকি সবকিছু ঠিকঠাকই আছে। বিশাল কাচের জানালাটা লাগানো, ফার্নিচারগুলোও আছে জায়গামত। একমাত্র পেছনের দিকের দরজাটাই খোলা। সবটা দেখে পুরোপুরি নির্বাক হয়ে গেল আর্য। ভেতরটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে সব। হাঁটু ভেঙে ধপাস করে বসে পড়ল সে। দরজার কাছেই রিশাভ মূর্তির মতো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। তার পা দুটো ঝড়ের রাতে গাছের পাতা যেমন কাঁপে ঠিক তেমন কাঁপছে। কিন্তু নিজেকে ঠিক রাখতে চেষ্টা করল সে। জোরে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে দেওয়াল হাতড়াতে লাগল বাতি জ্বালাবার জন্য। সুইচ টিপতেই লাইট জ্বলে উঠল। তারপর ইশার নিথর দেহের দিকে এগিয়ে নিচু হয়ে বসল সে। শ্বাস প্রশ্বাস আছে কিনা পরীক্ষা করতে লাগল। নাহ্, নিঃশ্বাস নেই। হতাশ দৃষ্টিতে আর্যের দিকে তাকাল রিশাভ।

ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'আ...আর্য, আমি পুলিশকে ফোন করতে যাচ্ছি। তুই এখানেই থাক। খেয়াল রাখবি কেউ যেন এই রুমে না আসে। কি হলো? শুনতে পাচ্ছিস?'

মনে হয় না আর্য রিশাভের একটা কথাও শুনতে পেয়েছে। অন্য এক জগতে চলে গেছে সে। যেখানে বাস্তবতা আর যুক্তির সংঘর্ষ সবসময় বিদ্যমান। মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে, এই অসাধারণ মেয়েটি অরোরা সিমেন্ট কোম্পানির বোর্ড মেম্বারদের সাথে মিটিং করে আসলো। কিন্তু এখন? রক্তমাখা শরীর নিয়ে ফ্লোরে পরে আছে মৃত অবস্থায়। কি এমন কর্ম করেছিল ইশা যা তার কপালে এই পরিণতি বয়ে আনলো? আর্য তার ভাইয়ের দিকে তাকাল। রিশাভের মুখের নড়চড় দেখতে পারছে সে। কিন্তু কোনো কথাই বুঝতে পারছে না। মনে হচ্ছে খুব দূরে পানির নিচ থেকে কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে।

রিশাভ পুনরায় কী কী করতে হবে বলল। কিন্তু কাজ হলো না। তবে এবার আর রেসপন্সের আশায় রইল না রিশাভ। দৌড়ে চলে গেল পুলিশকে ফোন দিতে। যখন লিভিংরুমে ফিরে এল সে, দেখল তাদের দুই কাজের লোক মীরা ও জ্যোতি রুমের এক কোণায় বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সবকিছুই কেমন যেন ধীরগতিতে হচ্ছে। তার সৎ বোন রেশমিকে দেখতে পেল সে। দেওয়ালে হেলান দিয়ে নির্বাক পড়ে আছে। বড় ভাই প্রণব চেষ্টা করছে রেশমিকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। রিশাভের চোখে অশ্রু টলটল করছে। অস্পষ্ট হয়ে আসছে সবকিছু। আর্যকে দেখল ফ্লোরে বসে আছে। সবকিছু কেমন ধীর হয়ে ধরা দিল তার চোখে। চোখ বন্ধ করল রিশাভ। মুহূর্তেই নিকষ অন্ধকারের জগতে হারিয়ে গেল সে। ধপাস করে বসে পড়ল ঘরের ফ্লোরে।

আধঘন্টা পরই ছয়জন পুলিশ অফিসার ঘটনাস্থলে চলে এলেন। আসামাত্রই তারা কাজ শুরু করলেন। বাড়ির সবাইকে বলে দিলেন লিভিংরুমে অপেক্ষা করতে। পুলিশের তদন্ত কাজে টুকটাক সাহায্য করতে লাগল প্রণব। সবার চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ। রুমের এক কোণায় বসে জ্যোতি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ভয়ে। তাকে সান্ত্বনা দিতে যথেষ্ট চেষ্টা করতে লাগল মীরা।

রিশাভ কিছুটা শান্ত হয়েছে। কাঁচের প্রবেশদ্বারে হেলান দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে দূরে তাকিয়ে আছে সে। চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পরছে। জীবন হলো ছোট্ট একটা বাক্য। কেউ জানে না কখন সে এই বাক্য ফুলস্টপে পৌঁছে যাবে। ভাবল রিশাভ। চোখ বন্ধ করে আবার খুলল সে। ভাবল এসব ভাবনা দূর হয়ে যাবে। কিন্তু হলো না। নিরাশ ভাবনা পুনরায় তাকে জর্জরিত করল।

ইশা অরোরা। রিশাভের বোন, পথপ্রদর্শক এবং বন্ধুও ছিল। ইশা ছিল এতিম এক মেয়ে। রিশাভের বাবা বিশাল অরোরা একটা এতিমখানা থেকে ইশাকে দত্তক নিয়েছিলেন। পরে অরোরা সিমেন্ট কোম্পানির উত্তরাধিকারিও করে যান। অরোরা সিমেন্ট কোম্পানির এই তরুণী রীতিমতো একজন তারকা ছিল। বার্সেলোনার ইউপিসি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি অর্জন করেছিল সে এবং মাস্টার্স করেছিল কর্নেল ইউনিভার্সিটি থেকে। দুটো গুণ ইশাকে সবার কাছে প্রিয় করে তুলেছিল। ব্যবসা সামলানোর দারুণ আত্মবিশ্বাস এবং কোম্পানির শ্রমিকদের প্রতি তার ভালোবাসা। সবকিছু যথেষ্ট ভালোভাবে সামলাতো সে। তার কথা বলার ভঙ্গিতে কেউ প্রশংসা না করে পারত না, অনেক শ্রোতা ঈর্ষাও করত। বছরখানেক আগে, প্রতিদ্বন্দী সিমেন্ট কোম্পানির সাথে দারুণ এক চুক্তি করে সব ভালোভাবে সেটেল করেছিল ইশা। একবার হিমাচল প্রদেশের এক স্বনামধন্য পত্রিকায় তার একটা ছবি ছাপা হয়। ঢিলেঢালা সাদা শার্ট, লম্বা স্কার্ট এবং কানে দুল পরিহিত সেই ছবি প্রকাশিত হওয়ার পর যখনই সে কোথাও বের হতো লোকেরা তার দিকে হুমড়ি খেয়ে পরত। ঠিক যেমনটা সূর্যমুখী ফুল তাকিয়ে থাকে সূর্যের দিকে। ইশা ছিল উনত্রিশ বছর বয়সী অপরূপা এক যুবতী। যার জীবনের সাথে অরোরা সিমেন্ট কোম্পানির নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেহগড়নে সে ছিল লম্বা এবং ক্ষিপ্রগতির। ব্যাডমিন্টন কোর্টে একটা তরুণের চেয়েও ইশা বেশি দ্রুত স্থান বদল করতে পারত। খেলা শেষে তার ঘামে ভেজা মুখটা দেখতে দারুণ লাগত। কোর্টের সবাইকে চকলেট ও কোল্ড ড্রিংকস দিয়ে আপ্যায়ন করত সে। এসব তরুণদের অনেকে আবার ইশার রূপে মুগ্ধ ছিল। কেননা তার তুলতুলে গাল, নিটোল গড়ন আর চকচকে চোখ দেখে বিভোর না হয়ে পারা যেত না।

কিছুটা দূরেই, বাতাসে গাছের পাতা নড়াচড়া করছে। ব্যাডমিন্টন কোর্টটা এখনো দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ পাথরের উপর দিয়ে কারো হেঁটে আসার ঠকঠক আওয়াজ শোনা গেল। দ্রুতই প্রবেশদ্বার দিয়ে একজন ব্যক্তিকে ভেতরে আসতে দেখল রিশাভ। ইনি ইন্সপেক্টর রশিদ। পলমপুরের সবচেয়ে উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা। ছোটখাট গড়ন। সুঠাম দেহের অধিকারি তিনি। গোলাকার মুখটা ভদ্র ব্যক্তিত্বের জানান দিচ্ছে। বয়স পঞ্চাশ বছর হবে। স্বভাবে একটু আয়েসী, তবে বুদ্ধিমান। সাধারণ জনতার মতো আলসে নন। সহকর্মীরা তাকে 'দ্য জ্যাকেল' নামে ডাকে। কারণ অপরাধী সনাক্ত করার ক্ষেত্রে তার জুড়ি নেই। দুজন অফিসার তাকে নিয়ে ইশার রুমে গেলেন। মৃতদেহের উপর ভালোভাবে চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি। তারপর ঘরটা একটু পরিদর্শন করে মৃতদেহের পাশে হাঁটু মুড়ে বসলেন।

'নবপ্রীত, এখন পর্যন্ত কী কী ক্লু পেলে?' ধীর গলায় বললেন ইন্সপেক্টর রশিদ। তার দৃষ্টি এখন ছোটোখাট গড়নের ফর্সা সাব-ইন্সপেক্টর নবপ্রীতের দিকে। সাব-ইন্সপেক্টর নবপ্রীতের ভুঁড়ি বেরিয়ে আছে অনেকটা। যা ইন্সপেক্টর রশিদকে অবাক করল। তার মনে হলো অপরাধী ধরার বদলে নবপ্রীত হয়তো সারাটা সময় খেয়ে খেয়ে কাটায়।

'স্যার, ভিকটিমের নাম ইশা অরোরা। অরোরা সিমেন্ট কোম্পানির নির্বাহী প্রধান ছিলেন তিনি। মনে হচ্ছে মাথায় কোন ধাতব যন্ত্র দিয়ে খুব জোরে আঘাতের ফলে তার মৃত্যু হয়েছে।'

খুব গুছিয়ে কথাগুলো বললেন সাব-ইন্সপেক্টর নবপ্রীত। শুনে ইন্সপেক্টর রশিদ ফের দেহটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে লাগলেন। সাব-ইন্সপেক্টর নবপ্রীত পুনরায় বললেন, 'মিস ইশাকে সর্বশেষ সাড়ে চারটার দিকে এ বাড়ির একজন কাজের লোক দেখতে পেয়েছিল। তিনি তখন কালো সোয়েটার পরিহিত ছিলেন। কিন্তু সোয়েটারটা আমরা এখনো খুঁজে পাইনি।'

শুনে ইন্সপেক্টর রশিদ বিস্মিত হলেন। বললেন, 'খুঁজে পাওনি মানে?'

'স্যার, আমরা পুরো ঘরে খুঁজেছি। কিন্তু কোথাও নেই সেটা।'

ইন্সপেক্টর দাঁড়িয়ে গেলেন। এখনো তিনি চারপাশটা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করছেন। ততক্ষণে সাব-ইন্সপেক্টর নবপ্রীত পেছনের দরজার কাছে গেলেন।

'স্যার, পেছনের এই দরজাটি খোলা ছিল যখন ভিকটিমের মৃতদেহ পাওয়া যায়। কিন্তু বাড়ির সবার ভাষ্যমতে, পেছনের এই দরজাটি কখনো ব্যবহৃত হয় না।' অকস্মাৎ বলে উঠলেন সাব-ইন্সপেক্টর। জবাবে ইন্সপেক্টর রশিদ কিছু বললেন না, চুপ করে রইলেন, ভালো করে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন রুমটা।

'কোনো সিঁধেল ডাকাতি বলে মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা।' বিড়বিড় করে বললেন ইন্সপেক্টর রশিদ। জবাবে আত্মবিশ্বাসী গলায় সাব-ইন্সপেক্টর বললেন, 'আসলেই না। ভিকটিম দরজাটা খুলেছেন...'

'নিজে নিজেই।' কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠলেন ইন্সপেক্টর রশিদ। 'কিন্তু নবপ্রীত, অন্যান্য বিষয়ের মতো এটাও কেবল একটা সম্ভাবনা মাত্র।' শুনে সাব-ইন্সপেক্টর নবপ্রীত দ্বিধায় পরে গেলেন।

'তাহলে অন্যসব সম্ভাবনা কী কী স্যার?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। ইন্সপেক্টর রশিদ বললেন, 'তোমার কী মনে হয় না খুনি আমাদেরকে ভুল পথে নেওয়ার জন্য এই কাজটা করে থাকতে পারে? এটাও তো হতে পারে যে, খুনি সামনের কোনো দরজা দিয়েই ভেতরে এসেছে। ভিকটিমের মাথায় শক্ত কিছু দিয়ে পেছন থেকে জোরে আঘাত করেছে। তারপর ইচ্ছে করেই পেছনের এই দরজাটা খুলে রেখে গেছে আমাদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য।'

কপালে অসচেতনভাবে হাত চলে গেল ইন্সপেক্টর রশিদের। 'হারানো সোয়েটারটা আসলেই একটা জটিল বিষয়। আর এটা কোনো যৌন নির্যাতনের ফল বলেও মনে হচ্ছে না, তাই না?' এ পর্যন্ত বলেই থামলেন তিনি। সকলের চোখেমুখে চিন্তার ছাপ। 'বাইরে আমাদের লোক আছে?'

'জ্বি স্যার।' তাৎক্ষণিকভাবে জবাব দিলেন সাব-ইন্সপেক্টর নবপ্রীত। এরপর হাঁটতে হাঁটতে ইন্সপেক্টর দরজার কাছে গেলেন এবং বাইরে তাকালেন। আঁধারে ডুবে আছে চারপাশ। বাড়ির দেওয়ালগুলো খুব উঁচু। দেওয়ালগুলোর উপরে আবার কাঁচের টুকরো বসানো আছে। তিনি পেছন দিকে ফিরলেন। বললেন, 'খুনটা ভেতরের কারো কাজ। এ ব্যাপারে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। হিসেব করে দেখা যাক। এখন পর্যন্ত আমরা দুটি বিষয় পেয়েছি। তা হলো– খোলা একটা দরজা এবং একটি সোয়েটার (যা কিনা রহস্যময়ভাবে হারিয়েছে)।' বলেই থামলেন তিনি। মনে মনে কিছু হিসেব মিলিয়ে নিলেন। 'নবপ্রীত, এখানে তোমার কাজ শেষ হয়ে গেলে তুমি বাড়ির সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করো। বাড়ির কে কোথায় অবস্থান করছিল এটা আমাকে জানতেই হবে। আর সোয়েটারটা যদি খুঁজে পাও সেটাও আমাকে জানাবে সাথে সাথে।'

শেষবারের মতো তিনি মৃতদেহের দিকে তাকালেন ইন্সপেক্টর রশিদ। এরপর ইশার রুম ত্যাগ করে লিভিংরুমে প্রবেশ করলেন। মাথায় নিজের পুলিশ ক্যাপটি পরে নিলেন। সবার দিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন একটু। প্রত্যেককেই খুব ব্যথিত দেখাচ্ছে। একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে তিনি বলতে শুরু করলেন, 'আমি আপনাদের এই অপূরনীয় ক্ষতির জন্য খুব দুঃখিত। মিস অরোরা আভিজাত এক মেয়ে ছিল নিঃসন্দেহে। তবে এটা খুনের মামলা। ইশার রুমে সব ঠিকঠাক। কিছুই সরানো হয়নি। ভিকটিম একটা ট্রাউজার পরিহিত ছিল। মাথায় সজোরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এটা নৃশংস

খুন। ভয়ানক খুন। আচ্ছা, শুনলাম সাড়ে চারটার সময় বাড়ির কাজের লোক নাকি তাকে শেষবারের মতো জীবিত দেখেছিল?'

'হ্যাঁ।' জ্যোতি ফুঁপিয়ে বলে উঠল ঘরের কোণ থেকে।

'আচ্ছা...' ইন্সপেক্টর কিছু বলতে যাবেন, অমনি অনুভব বলে উঠল, 'আমি পাঁচটা বাজার কিছুক্ষণ আগে ইশাকে দেখেছি।'

অনুভব অরোরা সিমেন্ট কোম্পানির শোলান এরিয়া ম্যানেজার। এছাড়াও ইশা এবং তার ব্যাপারে স্থানীয় লোকের মুখে নানা গুঞ্জন শোনা যায়। ইন্সপেক্টর তার দিকে ফিরলেন। চেহারায় বিষণ্ন অভিব্যক্তি ও দৃশ্যমান যন্ত্রণা বাদে মুখটি খুব চেনা মনে হলো তার।

'আমাকে বলবেন ইশার পরনে তখন কী ছিল?' জিজ্ঞেস করলেন ইন্সপেক্টর।

'ইশা কালো একটি সোয়েটার পরা ছিল। সেটার পেছনে করনেল লেখা ছিল। করনেল ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছে সে। লেখাটা সেই ভার্সিটিরই ব্র্যান্ড স্যার' অনুভব জবাব দিল।

'আমার মনে হচ্ছে আমিই তাকে সর্বশেষ দেখেছি। আমি পাঁচটা বেজে দশ মিনিট পর্যন্ত তার সাথে ছিলাম।' আত্মবিশ্বাসী গলায় বলে উঠল নয়না। অরোরা সিমেন্ট কোম্পানির অ্যাকাউন্টেন্ট সে। ইন্সপেক্টর এই যুবতী মেয়ের দিকে তাকালেন।

'বুঝতে পারছি। তখনও সে সোয়েটার পরা ছিল?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'হ্যাঁ, তখনও সোয়েটার পরা ছিল।' দ্রুত জবাব দিল নয়না।

'ওহ।' আনমনা ভাবে বললেন ইন্সপেক্টর।

'আচ্ছা পুলিশকে খবর দিয়েছে কে?'

'আমি দিয়েছি।' সোফায় বসা রিশাভ জবাব দিল।

'ওহ, তুমিই তাহলে রিশাভ?' ইন্সপেক্টরের বড় ছেলে এবং রিশাভ একসময় একই ক্লাসে পড়ত। ভালো ছাত্র ছিল রিশাভ। ক্লাসে সবসময়ই টপে অবস্থান করত। ইন্সপেক্টর তার কাছে গেলেন। তারপর আরাম করে টেবিলের উপর বসে সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলেন। সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে।

'দেহটা একবারও নড়েনি?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। সিগারেটের জ্বলজ্বলে শলাকা পুড়ে যাচ্ছে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রিশাভ।

'ইশার মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি কিছু করিনি। কেবল আর্যই ওখানে ছিল।'

আর্যর দিকে তাকাল রিশাভ। হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়াল আর্য।

'ঠিক আছে। তো আমরা ইশার পরা সোয়েটারের কোনো খোঁজ পাচ্ছি না। কেউ কি সেটা দেখেছেন? বা ভুলক্রমে নিয়ে গেছেন?' বলেই সবার

দিকে তাকালেন ইন্সপেক্টর রশিদ। কেউ কোনো জবাব দিল না। 'ধ্যাত! খুবই বাজে ব্যাপার এটা। সমস্যা নেই। আমরা সেটা খুঁজে বের করব। আপাতত আপনারা সবাই এখানেই থাকুন। অফিসাররা প্রাথমিক অনুসন্ধান শুরু করবে। হয়তো আপনাদের ফিঙ্গারপ্রিন্টও নেবে। ভেতরে সাব-ইন্সপেক্টর নবপ্রীত আছে। তিনিই আপনাদের জবানবন্দি নেবে। আশাকরি সবাই তাকে সহযোগিতা করবেন। ততক্ষণে আমি রিশাভ ও আর্যর সাথে একটু কথা বলতে চাই।' বলেই তিনি রিশাভ ও আর্যর দিকে তাকালেন। 'তোমরা কি আমাকে তোমাদের রুমে একটু সময় দিতে পারবে?'

দুই ভাই মাথা ঝাঁকালো। তারপর ইন্সপেক্টর একজন অফিসারকে বিভিন্ন তথ্য বুঝিয়ে দিয়ে রিশাভের পেছন পেছন তার রুমের দিকে চললেন।

রিশাভের রুমটা দেখতে চমৎকার। রুমের ভেতর সুন্দর কাঠের ফার্নিচার। দেওয়ালে সাজানো নানা চিত্র। রুমের প্রতিটা কোণায় কাঠের স্টান্ডের উপর সজ্জিত আছে কাঁচের ভাস্কর্য। ভেতরে ঢুকে দুই ভাই টেবিলের কাছে একটা সোফায় বসল। টেবিলের উপর নানা ধরনের ম্যাগাজিন ও সংবাদপত্র রাখা। ইন্সপেক্টর কাঁচের জানালাটার দিকে গেলেন এবং তা খুলে দিলেন। বাইরে একেবারে অন্ধকার। জানালা সংলগ্ন আরো একটা টেবিল আছে। সেটার উপর একটা ডেস্কটপ রাখা। টেবিলে হাত ঘষে তিনি তার পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করলেন। মনে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে তার। সদ্য বোন হারানো দুজন তরুণকে কেমন প্রশ্ন করা যায়? মুখের মাঝে সিগারেট গুজলেন তিনি। লাইটার দিয়ে আগুন ধরালেন। সিগারেটে টান দিতেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী তার মুখ দিয়ে বের হতে লাগল। প্রত্যেকটা টানে স্কুল জীবনে প্রথম সিগারেট টানার স্বাদের কথা মনে হলো তার। জায়গাটা ছিল দেরাধুনের একটা জলাধারের সামনে। আজকের মতো সেদিনও তিনি নিজের সব সংশয় উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সিগারেট টানতে টানতে হঠাৎ তার চোখ পড়ল আকর্ষনীয় একটা মাছের মূর্তির উপর।

'খুব সুন্দর। কি এটা?'

'এটা মুরাল। আইল্যান্ড থেকে আনা ভেনিশিয়ান কাঁচের ভাস্কর্য। আমি কাঁচের ভাস্কর্য এবং আঁকা ছবি পছন্দ করি। ইশা এই ভাস্কর্যটা ভেনিস থেকে আমার জন্য নিয়ে এসেছিল।' রিশাভ জবাব দিল।

'দেখে মনে হচ্ছে খুব দামী।' বললেন ইন্সপেক্টর। রিশাভের জন্য সমবেদনা অনুভব করছেন তিনি। ছেলেটি সদ্যই তার বোনকে হারিয়েছে। খুব মর্মান্তিক বিষয়। তাও যতটুকু সম্ভব নিজের ভেতরের কষ্ট, আবেগ ধরে রাখতে চেষ্টা করছে।

'আসলে তা নয়। সেটার দাম পঞ্চাশ ডলার মাত্র। ইশা এটা...' ইশার নামটা উচ্চারণ করা মাত্রই রিশাভ নিজের ভেতরে হাহাকার অনুভব করল। নিজেকে সামলে নিল সে। 'একটি কাঁচ তৈরির কারখানা থেকে ইশা এটা কিনেছিল। তাই খুব কম দামে পেয়েছিল।' বলেই রুমাল দিয়ে মুখটা ঢেকে ফেলল রিশাভ। এক মুহূর্তের জন্য ইন্সপেক্টর রশিদ ভাবলেন তার জীবনটা যদি এই কাঁচের শোপিসের মতো হতো তাহলে মন্দ হতো না। ঝামেলা মুক্ত জীবন। পরক্ষণেই মাথা ঝাঁকিয়ে দরকারি কিছু ভাবতে প্রস্তুত হলেন, যেসব ভাবনা এই কেসে কাজে লাগবে।

'শোনো বাবারা, আমি জানি আজকের দিনটা তোমাদের দুজনের জন্যই খুব ভয়াবহ। কিন্তু তোমাদের সাহায্য লাগবে আমার। তদন্তের জন্য এতটুকু করতে পারবে তো?'

আর্য হ্যাঁ সূচক মাথা ঝাঁকাল।

'বেশ, মৃতদেহ দেখার আগে তোমরা দুজন কি করছিলে?'

আর্য দুঃখী চেহারায় রিশাভের কাঁধে হাত রাখল। তারপর বলল, 'আ...আমরা জগিং করছিলাম। মানে আমি আর রিশাভদা দুজনে জগিং করছিলাম তখন। নিজেকে শান্ত রাখতে একটা দীর্ঘশ্বাস নিল সে। 'প্রতি সপ্তাহে ছুটির দিনে আমরা একসাথে জগিং করি। বাড়ির চারপাশে গোলাকার যে রাস্তা আছে সেখানেই।' যথেষ্ট ভালোভাবে উত্তর দিতে চেষ্টা করছে আর্য। 'আজকে, সাড়ে চারটার দিকে আমরা জগিং শুরু করি। আধ ঘন্টার ভেতরই আমরা দশটা রাউন্ড শেষ করি। তারপর সবসময়ের মতো আজো রিশাভ দাদা অতিরিক্ত একটা রাউন্ড দিতে যায়। আমি তখন বারান্দায় গিয়ে বসি। দাদা ফিরে আসার পর ক্রিকেট নিয়ে আমাদের মাঝে কথাবার্তা হয়। তারপর সাড়ে পাঁচটার দিকে আমরা বাড়ির ভেতরে চলে যাই। ঠিক তখনই আমরা জ্যোতিকে দেখতে পাই করিডরে। চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে আমাদের দিকেই আসছিল সে। এরপরই আ...আমরা ইশাদির রুমে গিয়ে তার লাশ দেখতে পাই।'

আর্যের চমৎকার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা দেখে মৃদু হাসলেন ইন্সপেক্টর। ওভারকোটের ভেতর থেকে একটা নোটবুক বের করলেন তিনি। তারপর হিজিবিজি করে কিছু একটা লিখলেন।

'এই সময়ের মধ্যে বাইরে থেকে কেউ ভেতরে এসেছিল? বা বাড়ির কেউ বাইরে বেরিয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন ইন্সপেক্টর।

রিশাভ উপরে তাকাল। 'কেবল আমাদের সৎ বোন রেশমী।' ভেবেচিন্তে বলল সে। 'সময় তখন চারটা বেজে পয়ঁত্রিশ মিনিট, আমরা মাত্রই জগিং শুরু করেছি। রেশমি তখন ফোনে কারো সাথে উচ্চ আওয়াজে কথা বলছিল, শাসাচ্ছিল। আমাদের দৌড় শেষ হওয়ার পর বারান্দায় বিশ্রাম নেওয়ার সময়ও তাকে দেখেছি আমরা। সময় তখন আনুমানিক পাঁচটা

বেজে পাঁচ মিনিট। তারপর থেকে পুরোটা সময় আমাদের সামনাসামনিই ছিল সে।'

ইন্সপেক্টর তথ্যটা টুকে নিলেন। তার শুষ্ক ঠোঁটে সিগারেট, জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। একে অপরের সাথে ইশা, প্রণব, রেশমি, রিশাভ এবং আর্যের সূত্রতা কীরকম- ভাবতে লাগলেন তিনি। 'আমি তোমাদের পারিবারিক পরিচিতি নিয়ে কিছুটা দ্বিধায় আছি। তোমাদের বাবা কি দুটো বিয়ে করেছেন?'

জানালা দিয়ে আসা ঠান্ডা বাতাসে রিশাভ অস্বস্তি বোধ করছে। অথবা হতে পারে সিগারেটের ধোঁয়ায়, কিংবা দুটোর কারণেই। কিন্তু কোনো অভিযোগ করল না সে। কেবল একটু কেশে গলা ঠিক করে নিল।

'হ্যাঁ, আমার বাবা ভিশাল অরোরা দুটো বিয়ে করেছেন। তার প্রথম স্ত্রী ছিলেন বিখ্যাত অভিনেত্রী অর্চনা গুলাতি। বিয়ের প্রথম চার বছর কেটে গেলেও তাদের কোনো সন্তান হয়নি। তাই তারা ইশাদিকে একটি এতিমখানা থেকে দত্তক নেন। তার বয়স তখন দুমাস। তাকে দত্তক নেওয়ার এক বছরের মধ্যেই যমজ সন্তান জন্ম দেন আমার সৎ মা। এদের মধ্যে একজন হলো প্রণব, আরেকজন রেশমি। যারা কিনা এখন বাইরে বসে আছে। সন্তান জন্মের তিন বছর পর অর্চনা অবসরপ্রাপ্ত একজন আর্মি মেজরের সাথে পালিয়ে যান। এরপর থেকে তার কোনো খবর কেউ জানে না।'

প্রণব এবং রেশমি যমজ ভাইবোন, জন্মের পর ডাক্তার তাদেরকে 'ভ্রাতৃসুলভ যমজ' নামে অভিহিত করেছিলেন। জেনেটিক্যালি তারা অদ্বিতীয়। তবে শৈশবে তাদেরকে ভিন্ন দেখাত একেবারে।

রেশমির চেয়ে প্রণব এগারো মিনিটের বড় ছিল। দেখতে শুনতে সে ছিল গুরুগম্ভীর এবং মোটাসোটা। বিপরীতে রেশমি ছিল ফর্সা আর চিকন। কাজেই, যমজ দুই ভাইবোনের 'কোনটা কে' এমন কোনো মুহূর্ত কখনো তৈরি হয়নি। যমজ ভাইবোন অ্যারোপ্লেন খুব পছন্দ করত। তাদের রুম সবসময় নানা ধরনের খেলনা বিমানে ভরা থাকত। যখন তারা এসব নিয়ে খেলতে খেলতে বিরক্ত হয়ে যেত, তখন বাড়ির পাশের বড় অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আকাশপানে চলা উড়োজাহাজ দেখার জন্য অপেক্ষা করত। ভাগ্য খুব ভালো না হলে বেশিরভাগ সময়ই তাদেরকে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। রেশমির চেহারায় তখন বিষণ্নতা ভর করত। এটা দেখে প্রণব পাশ থেকে কিছু ঘাস তুলে নিয়ে তার দিকে ছুড়ে মারত। শুরু হয়ে যেত তাদের লড়াই। দুর্দান্ত লড়াই।

নিজ কক্ষের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ইশা তাদের দুই ভাই বোনকে দেখত। একদিন লাঞ্চের আগে রেশমি লাপাত্তা হয়ে যায়। চার ঘন্টা খোঁজাখুজি করেও কেউ তার হদিস পায়নি। শেষে প্রণব একটা পুকুরপাড়ে

তাকে দেখতে পায়। বৃষ্টি হচ্ছিল। তার হালকা সবুজ টি শার্ট ভিজে জবজব হয়ে গিয়েছিল। ফলে একটা ছায়া বা তার চাইতেও বেশি অন্ধকার কিছুর মতো লাগছিল তাকে। মুখটা পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে গিয়েছিল, চোখ দিয়ে পরছিল পানি। বৃষ্টির মাঝেও প্রণব সেটা বুঝতে পেরেছিল। একটা প্রশ্ন রেশমিকে কষ্টে জর্জরিত করে তুলছিল– 'মা কেন আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেল?'

প্রণব তার কাছে গিয়ে তখন বলেছিল, 'এটা কোনো ব্যাপার না। আমি তোর সাথে আছি সবসময়।'

তারপর হাতে হাত রেখে দুজন বাড়ি ফিরেছিল সেদিন। ঐদিনও ইশা তাদেরকে জানালা থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল। কেউ কখনোই ইশার হাতটা ধরেনি অমন করে। ইশা এরোপ্লেন পছন্দ করত না। ট্রেন ছিল তার খুব পছন্দের। সমবয়সী বাচ্চাদের মতই ট্রেনে ইশা জানালার পাশের সিট পছন্দ করত। ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত নৈসর্গিক পরিবেশ, সঙ্গীতের সুরে চাকার বিরতিহীন ছুটে চলার আওয়াজ এবং বাঁক নেওয়ার সময় ইঞ্জিনের দৃশ্যমান হওয়ার বিষয়গুলো তার ছোট্ট হৃদয়কে আন্দোলিত করত। এছাড়াও শক্তসামর্থ্য মেয়ে ছিল সে। প্রায়ই জাম গাছে উঠত। থোকায় থোকায় ঝুলন্ত কালো পাকা জামগুলো পেরে রেখে দিত পরে লবণ মেখে খাবার জন্য। যদি কখনো প্রণব ও রেশমির কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেত, এই আনন্দ হাসিমুখে তাদের সাথে বিনিময়ে করত সে। তাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতার আশা ঐদিন মিশে গেল যেদিন তাদের খেলায় বিরক্ত করেছিল ইশা। একদিন প্রণব ও রেশমি বারান্দায় খেলা করছিল। তাদেরকে দেখে ইশারও খেলার ইচ্ছে জাগে। তাই হাসিমুখে ভাইবোনের কাছে যায় সে। বলে, 'দাদা, আমিও তোমাদের সাথে খেলব। আমাকে দলে নাও।'

প্রণব নাক সিটিয়ে বলেছিল, 'আমাকে দাদা বলবি না। আমি তোর কেউ নই!'

'তুমি আমাদের নিজেদের কেউ হওয়ার চেষ্টা মোটেও করবে না বলে দিলাম। ড্যাডি তোমাকে ডাস্টবিন থেকে তুলে এনেছে। সেখানেই কেন ফিরে যাচ্ছ না তুমি?' বিরক্তি নিয়ে বলেছিল রেশমি। ইশা সেদিন অশ্রুসজল চোখে দৌড়ে চলে গিয়েছিল। পরিবারের মাঝে থেকেও সে একজন এতিমের মতোই জীবন কাটাচ্ছিল।

রিশাভ পুনরায় কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল। এবার সে নিশ্চিত সিগারেটের ধোঁয়ার কারণেই এমন হচ্ছে তার। তবুও ইন্সপেক্টরের কাছে অভিযোগ করল না সে। 'বাবা তারপর আমার মা সুনন্দা রায়কে বিয়ে করেন। এক বছর পরই আমার জন্ম হয়। চার বছর পর যখন আর্যর জন্ম

হয়, মা তখন মারা যান। এর ঠিক দুই বছর পর বাবা মারা যান। তার আগে অরোরা সিমেন্টের পরিচালনার ভার ইশাকে বুঝিয়ে দিয়ে যান তিনি।'

মনোযোগ সহকারে সব শুনলেন ইন্সপেক্টর রশিদ। হাতের সিগারেটটা নিভিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন। মনে হলো সিগারেট ছোড়ার সাথে সাথে ইন্সপেক্টর তার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টিও ছুড়ে ফেললেন জানালা দিয়ে। পাশে থাকা জানালার শার্সিটা বন্ধ করলেন তিনি। তারপর আর্য আর রিশাভের সামনে থাকা চেয়ারে গিয়ে বসলেন। বললেন, 'রিশাভ, তুমি গত বছর আমেরিকা থেকে এসে কোম্পানিতে জয়েন করেছ। রাইট?'

মাথা নেড়ে জবাব দিল রিশাভ।

'তাহলে অনুমান করে বলতে পারি তুমি সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা, ভোটিংসহ এরকম আরো বিষয়ে জানো, তাই না?'

রিশাভ চিন্তাগ্রস্ত চেহারায় ইন্সপেক্টরের দিকে তাকাল। কিছু বলতে গিয়েও কি যেন মনে করে চুপ করে রইল। নিজেকে একটু সামলে নিল সে।

'হ্যাঁ। জানি।' রিশাভ জানে ইন্সপেক্টর কি জানতে চাইছেন, কিন্তু তার ভেতরে এই মুহূর্তে কাউকে প্রতিরোধ করার মতো শক্তি অবশিষ্ট নেই। 'পুরো সম্পত্তি আমাদের সকল ভাইবোনের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয়। যেহেতু ইশাদি অবিবাহিত ছিল, এখন তার সম্পত্তির অংশ এখন আমাদের ভেতর সমানভাবে বণ্টন হয়ে যাবে। বাবা ইশাকে অরোরা সিমেন্ট কোম্পানির নির্বাহী প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন যাতে সে সবচেয়ে উপরের স্থানে অবস্থান করতে পারে। তারপরের অবস্থানগুলো হলো প্রণব, রেশমি এবং তারপর আমি। একুশ বছর পূর্ণ হলে আর্যও এই কাতারে চলে আসবে।'

দেওয়ালে লাগানো ঘড়ির ঘন্টা আটবার বেজে উঠল। ইন্সপেক্টর চিন্তিত চেহারায়ও মৃদু হাসলেন। ফোমের চেয়ারটা থেকে তিনি ওঠামাত্রই ফুলে উঠল ফের। নোটবুকটি পকেটে পুরলেন। তারপর জানালার দিকে একটু এগিয়ে কী মনে করে যেন পেছন ফিরে তাকালেন। বললেন, 'শোনো ছেলেরা, আমার নিজের একটা বিশেষ থিওরি আছে।'

বিড়বিড় করে বললেন তিনি। তার চেহারায় দার্শনিক একটা ভাব ফুটে উঠল। 'যখন খারাপ কোনো রোগ হয় কারো, তখন তারা দুজনের পরামর্শ খোঁজে- বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ, পারিবারিক চিকিৎসকের পরামর্শ। যাইহোক, বিশেষজ্ঞদের কাছে এই ট্রেন্ডের চড়া মূল্য আছে। তারা যেকোনো রোগ সমন্ধে একটু বেশিই জানেন। তাই বলে পারিবারিক ডাক্তারকেও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কেননা রোগীর সমন্ধে তিনিই সবচে বেশি জানেন।'

রিশাভ ও আর্য এই কথার মানে বুঝতে পারল না। কেবল ইন্সপেক্টরের দিকে কৌতুহলী চোখে তাকিয়ে রইল দুজনে। ইন্সপেক্টর ওদের মনোভাব বুঝতে পেরে ব্যাখ্যা দিতে লাগলেন। 'আমি হচ্ছি এই কেসের বিশেষজ্ঞ। আমি বেশকিছু মামলার সমাধান করেছি। অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করেছি। নিজস্ব কিছু পদ্ধতিও আছে আমার। কিন্তু আমার দরকার একজন পারিবারিক ডাক্তার। আমি কি বলতে চাচ্ছি বুঝতে পেরেছ তোমরা?'

আর্যর কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠল। 'বুঝতে পেরেছি। আপনি আমাদের কথাই ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু আমাদের মতামত কীভাবে আপনার জন্য সহায়ক হতে পারে?' বলল সে।

শুনে ইন্সপেক্টর অধৈর্য্যের পরিচয় দিলেন। বললেন, 'আমি একজন বাস্তববাদী মানুষ। তেমন নই যারা কল্পনায় ভেসে বেড়ায়। তোমাদের মতামতের কোনো প্রয়োজন নেই আমার।' এটুকু বলে তিনি থামলেন। 'বাড়ির প্রত্যেক সদস্যদের প্রশ্ন করার সময় তোমরা কেবল আমার সাথে থাকবে। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাই যে প্রত্যেকেই সত্য কথা বলে কি না। তোমাদের উপস্থিতি তাদেরকে আষাঢ়ে গল্প বানানো থেকে বিরত রাখবে। কেননা এখানে যা ঘটেছে সে ব্যাপারে তোমরা জ্ঞাত। এটাই চাচ্ছি আমি, কোনো মতামত নয়।' বলেই হাসতে লাগলেন ইন্সপেক্টর। তারপর ধপাস করে চেয়ারে বসে নোটবুক বের করলেন। লিখলেন–

প্রণব, সৎ ভাই, সম্ভাব্য সন্দেহভাজন। কারণ– কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ নেওয়া।

ইন্সপেক্টরের পেছনেই দরজার নব খোলার শব্দ হলো। সাব-ইন্সপেক্টর নবপ্রীত দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে রুমে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। অনুমতি পেয়ে ভেতরে আসলেন তিনি। নানা কারণে তাকে 'ভুলু' ডাকতো সবাই। তার গোলাকৃতি শরীরের কারণ হলো অতিরিক্ত বিয়ার পান। অপরাধীদের সাথে মিশতে গিয়ে অনেক সময় বিয়ার নিতে হতো। এ্যালকোহলের তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব অপরাধী গ্রেফতারে ভালো সহায়ক হয়।

'স্যার আমরা কালো সোয়েটারের খোঁজ পেয়েছি। গেস্টরুমের বিছানার নিচ থেকে সেটা পাওয়া গেছে, যেখানে আপাতত মিস্টার অনুভব অবস্থান করছেন।' সজোরে বললেন সাব-ইন্সপেক্টর।

'ইয়েস! অনুভব খুরানা।' ইন্সপেক্টর রশিদ এমনভাবে চিৎকার করে উঠলেন যেন তিনি 'কৌন বনেগা ক্রোরপতি' অনুষ্ঠানের শেষ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছেন। 'আমার মনেও এই নামটাই ঘুরে ফিরে আসছিল। ধন্যবাদ তোমাকে নবপ্রীত। এক্ষুণি আমি বের হচ্ছি।'

তারপর তিনি দুই ভাইয়ের দিকে তাকালেন। 'উমম...অনুভব খুরানা... আচ্ছা ইনি কি সেই ব্যক্তি যার সাথে তোমাদের বোন ইশার ছবি ছাপা

হয়েছিল পত্রিকায়? সেই প্রেমিক পুরুষটাই নাকি? মনে হচ্ছে আজ তার নামে আরো একটি সংবাদ বেরোবে কীভাবে সে বেইলির ডিআইএসসি বারে মারামারিতে জড়িয়ে পরেছিল গতকাল।' এরপর ইন্সপেক্টর মাথা ঝাকিয়ে কি যেন মনে করার চেষ্টা করলেন। হঠাৎ তার চেহারায় পৈশাচিক হাসি খেলে গেল।

'রহস্য...জটিল রহস্য। তোমরা কি জানো বেইলির ডিআইএসসিতে আর কে কে উপস্থিত ছিল সেসময়?' বলেই ফের হেসে উঠলেন তিনি, নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। বিষয়টা এমন যেন বিড়াল তার বহু আকাঙ্ক্ষিত ইদুরের গর্ত খুঁজে পেয়েছে।

'সেখানে উপস্থিত ছিল ইশা। তার সাথে ঝগড়া হয়েছিল অনুভবের।' বললেন ইন্সপেক্টর। কথা শুনে সাব-ইন্সপেক্টর খোঁচা খোঁচা দাঁড়িগুলোয় আঙুল বুলাতে লাগলেন। তথ্যগুলো সাজিয়ে নিলেন মনে মনে। তারপর পকেট থেকে কলম ও নোটবুক বের করে সাথে সাথে তা টুকে নিলেন। কাগজের উপর পেন্সিলের বিরক্তিকর খচখচ শব্দ ভেসে আসতে লাগল। ইন্সপেক্টর বিড়বিড় করে কি যেন বললেন। মনে হলো তিনি কোনো হিসেব নিকেষ মিলিয়ে নিচ্ছেন। তারপর রিশাভের দিকে তাকালেন তিনি।

'মিস্টার অনুভব এখানে কী করছেন রিশাভ?'

'তিনি এখানে বোর্ড মিটিংয়ের জন্য এসেছেন স্যার।'

'বোর্ড মিটিং?' ইন্সপেক্টর রশিদ কিছুটা বিস্মিত।

রিশাভ বলল, 'জ্বি স্যার। অরোরা সিমেন্ট কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা আজ বিকেলে আয়োজিত একটা মিটিংয়ে অংশ নিয়েছিলেন। কয়েকমাস ধরেই স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বী জেকে সিমেন্ট কোম্পানির এসোসিয়েটদের সাথে মালিকানা নেওয়ার বিষয়ে নিজেদের মধ্যে খুব বিতর্ক হচ্ছিল। এ নিয়ে আমাদের মাঝে ভোটগ্রহণ করা হয়। এবং বেশিরভাগ ভোটই যৌথভাবে মালিকানা নেওয়ার পক্ষে পরে। আর দর কষাকষি করে দামও ঠিক করা হয়। সেই সুবাদে ইশা কেআর সিমেন্ট কোম্পানির মালিক এবং লক্ষ্মণ জেসওয়ালের পুত্র ধ্রুব জেসওয়ালকে আমন্ত্রণ জানায়। কারণ ইশা ক্ষমতার সম্ভাব্য মালিকানা এবং এই সমবায় ব্যবস্থায় পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা কি কি সুবিধা পাবে তা জানতে চেয়েছিল। মিস্টার অনুভব পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্য। তিনি শোলান এরিয়াতে আমাদের ব্যবসা দেখভাল করেন। গতকাল বিকেলে এখানে এসেছেন। এখনো বাড়িতেই আছেন। ধ্রুব সাহেব এসেছিলেন গতকাল সন্ধ্যার দিকে। তিনিও ভেতরই আছেন।'

শুনে ইন্সপেক্টর রশিদ মাথা ঝাঁকালেন। 'এটুকুই? নাকি আরো কিছু আছে?' এখনো তার বিস্ময় কাটেনি।

'বেশ, পরিচালনা পর্ষদের আরো পাঁচজন সদস্য মিটিংয়ের জন্য আজকে এসেছিলেন। নয়না তাদের মধ্যে অন্যতম। আমাদের কোম্পানির হিসাবরক্ষক সে। সেও এই বাসায় অবস্থান করছে।'

'অদ্ভুত!' মুখ বাঁকা করে বললেন ইন্সপেক্টর রশিদ। যেন বাজে কোনো ফল খেয়েছেন। একটু থেমে ফের বললেন, 'ওয়েট, আমি একটু মিলিয়ে নিচ্ছি। তাহলে ইশা ছাড়াও আজকে বাসায় আরো নয়জন উপস্থিত ছিল। তোমাদের বাবার প্রথম ঘরের যমজ ভাইবোন প্রণব ও রেশমি, যারা কিনা ইশার চেয়ে বয়সে ছোট। তোমরা দুইজন আছো। বাড়ির দুই কাজের লোক মীরা ও জ্যোতি ছিল। আরো ছিলেন শিল্পপতি ধ্রুব সাহেব ও হিসাবরক্ষক নয়না। সর্বশেষ মিস্টার অনুভব।' নাটকীয়ভাবে নামটা বললেন তিনি। 'যার রুমে ইশার সোয়েটার পাওয়া গেছে।' তারপর সাব ইন্সপেক্টরের দিকে তাকালেন ইন্সপেক্টর রশিদ।

'আমার মনে হয় এখান থেকেই কিছু একটা পাওয়া যাবে নবপ্রীত।' পরক্ষণেই তার মুখে দেখা গেল পরিচিত মুচকি হাসি। যদিও একটা বিষয়ে তিনি অসচেতন হয়ে আছেন। কারণ, এই ফাঁকে ইশা হত্যার সবচে বড় ক্লু রুম থেকে লাপাত্তা হয়ে গেছে। আর তা হলো– রহস্যময় সেই নীল খাম।

অরোরা ম্যানশন। পলমপুরের সবচে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বাসা। এই বাসায়ই ওঁত পেতে আছে ভয়ঙ্কর খুনী।

মন যেখানে বাধাহীন

জীবনের নির্মম বাঁকে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকেই অতীতের কথাগুলো ভাবতে পছন্দ করে। ভাবতে পছন্দ করে, ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখে না পড়ে ভিন্ন কিছু হলে কেমন হতো? তখন অতীত স্মৃতি স্মরণ করে বুক কেঁপে ওঠে। কেননা অতীতই গড়ে দেয় ভবিষ্যতের ভিত্তি। মনে তখন একটা কথাই বাজে, তা হলো- আমি কি কোনোভাবে এটা প্রতিরোধ করতে পারতাম না? অনুভব জানে সে কী করেছে অতীতে। জীবনের সোনালী সময়ের কথাগুলো মনে পড়ছে তার। মনে হচ্ছে, এসব গতকালকের ঘটনা, যদিও দশ বছর কেটে গেছে!

২০০৪ সাল। তখন বসন্তকাল। বার্সেলোনার সবচে খ্যাতিমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এসেছে অনুভব। দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় থাকে এখানে। তার চেয়ে বয়সে কিছুটা বড়। তিনিই 'ক্যারির ডি বামস' এভিনিউতে অনুভবকে সিঙ্গেল রুম এপার্টমেন্টের ব্যবস্থা করে দেন। জায়গাটা রোমান ক্যাথলিক চার্চ সাগরাদা ফ্যামিলিয়া থেকে এক মাইল দূরে।

অনুভবের রুমটা ছোট আকৃতির। তবে শোবার বিছানা, একটা আলমারি, পড়ার টেবিল এবং একটা বেসিনের জন্য যথেষ্ট জায়গা আছে। টেলিভিশন দেখতে সে খুব পছন্দ করে। তাছাড়া একটা ফ্রিজও দরকার ছিল। তবে বৃত্তির টাকায় ওগুলো কেনা সম্ভব ছিল না।

হালকা নীল রঙের দেওয়ালগুলো অন্যসব সাধারণ রুমের দেওয়ালের চেয়ে একটু বেশিই নান্দনিক। দরজার উপরের দিকে একটা চিত্র আঁকা। ছবির মেয়েটার হাত গোটানো। মাটিতে বিছানো খড়ের উপরে বসে উদাস তাকিয়ে আছে সামনের বিশাল সবুজের সমারোহে। ছবির উপর দুর্দান্ত একটা কথা লেখা- 'পৃথিবীতে সবকিছুরই সুন্দর সমাপ্তি ঘটবে। তা না হলে সেটা সমাপ্তিই নয়।'

ঘুম ভাঙতেই বিছানা ছাড়লো অনুভব। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। তার চোখ পড়ল দূরের সাগরাদা ফ্যামিলিয়া চার্চে। আন্দালুসিয়ার মেঘহীন আকাশে চার্চের উজ্জ্বল নীল রঙের মিনারটা চকচক করছে। খুব বিখ্যাত

চার্চ এটি। তাই পর্যটকদের ভীড় পরেছে সেখানে। যদিও মানুষের জট লেগে গেছে, তবুও কেউ হর্ন বাজাচ্ছে না। বিষয়টা অনুভবকে অবাক করল।

ইন্ডিয়ায় ট্রাফিক পোস্টে লাল বাতি জ্বালানো অবস্থায়ও কিছু লোক হর্ন বাজিয়ে সবার অবস্থা নাজেহাল করে ফেলে, ব্রেক করে গাড়ি না থামিয়ে উল্টো এক্সিলেটর চেপে রওনা হয়, যেন অমরত্ব লাভ করেছে। বার্সেলোনায় ঠিক তার বিপরীত চিত্র ফুটে উঠেছে।

কিছুক্ষণ নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখার পর অনুভব পেছন ফিরল। বেসিনের আয়নায় নিজেকে দেখতে লাগল। দীর্ঘ একটা ভ্রমণের ফলে চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ দেখা যাচ্ছে। ভুরু কুঁচকে ভালো করে দেখল নিজেকে। এলমেলো চুলগুলো হাত দিয়ে ঠিক করে নিল। ফ্যাশনপ্রিয় অনুভবের চুলগুলো মোলায়েম হওয়াতে চিরুনি দিয়ে আঁচড়াতে হয় না। হাত দিয়েই ঠিক করে নেওয়া যায়। দেখতেও বেশ সুদর্শন সে। তাই তার বন্ধুরা প্রায়ই তাকে কারণে অকারণে 'টম ক্রুজ' বলে ডাকতো। বেসিন ছেড়ে বিছানার কাছে গেল অনুভব। একটা চিঠি পরে আছে বিছানার উপর। খামের উপর লেখা–

'অভিনন্দন! আপনি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট অব কাতালোনিয়ায় চার বছরের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে পড়াশোনার জন্য মনোনীত হয়েছেন।'

পরদিন সকালবেলা। মেঘমুক্ত নীল আকাশ। শীতল বাতাস বইছে চারদিকে। রঙ বেরঙের পোশাক পরে পার্কে ছোটাছুটি করছে বাচ্চারা। প্রত্যেকেই খুব হাসিখুশি আর প্রফুল্ল। যদিও অনুভব নিজে কিছুটা পরিশ্রান্ত। কেন যেন অস্থির লাগছে তার। আজ কলেজের প্রথম দিন। তাছাড়া ভীনদেশের সাথে তাৎক্ষণিক মানিয়ে নেওয়াটাও কঠিন।

অনুভবের মনে হচ্ছে নতুন কোনো গ্রহে এসে পড়েছে সে। নতুন পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগবে। প্রথম দিনটা নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে কাটলো। রেজিস্ট্রার তাকে আইডেন্টিটি কার্ড দিতে অস্বীকৃতি জানাল। কেননা, অনুভবের বর্তমান চেহারার সাথে বাচ্চাসুলভ পাসপোর্ট সাইজের ছবির কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছিল না। এ নিয়ে দুজনের মাঝে ছোটখাট তর্ক বেধে যায়। শেষমেশ অনুভবকে একটা অস্থায়ী আইডি কার্ড দেওয়া হয়। যদিও ততক্ষণে সে ক্লাস লেইট করে ফেলেছে।

স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং, বার্সেলোনা। ধূসর রঙের দশতলা ভবনের এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। প্রত্যেকটা ফ্লোরে ডজনখানেকের বেশি ক্লাসরুম রয়েছে। দ্বিধায় পরে যায় অনুভব। এত বড় ভবনে কোনটা তার ক্লাসরুম? প্রশ্ন জাগে তার মনে। এদিক সেদিক খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে যখন নিজের ক্লাসরুম খুঁজে পায় সে, ততক্ষণে দশ মিনিট চলে গেছে

ক্লাসের। দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় অনুভব। গোলগাল মুখের টেঁকো মাথার এক শিক্ষক বোর্ডের মধ্যে কি যেন আঁকাআকি করছেন। ক্লাসের ছাত্রছাত্রীর সবার দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ। হাতের কলম চলছে এফওয়ান গাড়ির মতো দ্রুতগতিতে। কলেজের প্রথম দিন। মনে প্রচণ্ড শক্তি কাজ করছে। যেভাবে এরা নোট লিখতে শুরু করেছে, মনে হয় না এদের নোটবুক দশ দিনের বেশি যাবে। কিন্তু এর পরের ঘটনা দেখে কেউ হয়তো বিস্মিত হতো যে ফাইনাল ইয়ারে এসেও তারা একই নোট ব্যবহার করেছিল।

'ভেতরে আসতে পারি স্যার?'

সাহস নিয়ে বলল অনুভব। চুলগুলো এলমেলো হয়ে আছে। শার্ট ভেতরে ইন করা। ক্লাসটিচার তার প্রতি বড্ড বিরক্ত হয়েছেন বলে মনে হলো। তিনি এমনভাবে তাকালেন, যেন কেউ তার কাছে কিডনি দাবি করেছে। চক দিয়ে ডেস্কের উপর ঠকঠক করছেন তিনি। আর মনে মনে কি যেন ভাবছেন। পরক্ষণেই লেকচার দিতে প্রস্তুত হলেন। অনুভব ভীত হয়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগল দরজায় দাঁড়িয়ে।

'কঠোর পরিশ্রম প্রতিভাকে হারিয়ে দেয়, যখন প্রতিভা ভুলে যায় কঠোর পরিশ্রম করতে।' নিয়ম শৃঙ্খলার বর্ণনা দিতে গিয়ে চিৎকার করে বললেন ক্লাসটিচার।

'তোমরা জানো কীভাবে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়? বেশ, বলছি শোন। তোমাদের উচিত একটা রুটিন তৈরি করা এবং কঠোরভাবে সেটা অনুসরণ করা। নিয়মানুবর্তী হও। তা না হলে তোমরা কখনোই...'

এরপর তিনি বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনী থেকে নিয়মানুবর্তিতার অগণিত উদাহরণ দিতে লাগলেন। দার্শনিক প্লেটো থেকে শুরু করে পর্তুগিজ ফুটবলার ফিগো, কারো জীবনী থেকেই কোট করা বাদ দিলেন না। কিছু ছাত্রছাত্রী ওগুলো নোটে টুকে রাখল। প্রত্যেক ক্লাসেই এমন কিছু ছাত্রছাত্রী থাকে। ভেরি স্যাড! মনে মনে বলল অনুভব।

তারপর শিক্ষক অনুভবের দিকে তাকালেন। ভেতরে আসতে বলে তিনি বোর্ডের দিকে ফিরলেন। লজ্জায় মাথা নিচু করে ক্লাসরুমে প্রবেশ করল অনুভব। যেতে যেতে বসল গিয়ে পেছনের সারির একটা সিটে। দুজন স্প্যানিশ মেয়ের পাশেই একটা সিট খুঁজে পেল সে। এদের মধ্যে একজন দেখতে টমেটোর মতো গোলগাল, শ্যামবর্ণের এবং খাটো। অন্যজন দেখতে লম্বা, হলদেটে গায়ের রঙ, চোখদুটো বাদামি।

ক্লাসটিচার ফের বলতে লাগলেন, 'যেমনটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু মিস্টার স্টুডেন্টের জন্য আমাকে থামতে হলো।' অনুভবের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'তো বলছিলাম ডুকটিলি এবং মেলাবিলিটি হচ্ছে...'

লেকচার দিতে লাগলেন ক্লাসটিচার। অনুভব পাশে ব্যাগ রাখল। তারপর ভেতর থেকে একটা নোটবুক বের করল। তার মনে হলো, ক্লাসের সবাই হয়তো তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাই নিজের বামদিকে তাকাতে সাহস পেল না সে। পাশের সিটে বসা লম্বা স্প্যানিস মেয়েটার সোনালী ঘড়ি তার নজর কাড়লো। নিশ্চয়ই ঘড়িটা বেশ দামি হবে। ছোটখাট আকার। দেখতেও বেশ সুন্দর। মেয়েটা ডান হাতে পরেছে ঘড়িটা। তার লেখা একটু ধীরগতির। কিন্তু অক্ষরগুলো খুব সুন্দর হয়ে ফুটে উঠছে। একেবারে শৈল্পিক। মেয়েটার চেহারা দেখা যাচ্ছে না, একপাশের সমস্ত চুলে মুখটা ঢাকা পরেছে। হঠাৎ করে মেয়েটা অনুভবের দিকে তাকাল। লজ্জায় তৎক্ষণাৎ অনুভব অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। বুক কাঁপছে তার। সোজা সামনের দিকে পলকহীন তাকিয়ে রইল সে। শার্টের উপর দিয়ে বুক ধড়ফড় করার বিষয়টা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

ক্লাসের বিরতির সময় মেয়েটা তার সাথে আলাপ শুরু করে। এরপর আর লজ্জা লজ্জা ভাবটা বেশিক্ষণ থাকেনি। ল্যাটিন ভাষায় মেয়েটি প্রথমে বলল, 'আলা, সয় অ্যানেট। ইরেস ডি আকুই?'

কয়েক মুহূর্তের জন্য অনুভব তার সহপাঠিনীর মায়াবী চোখে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। মেয়েটির এমন বাদামি চোখ, নিটোল দেহ বাস্তবের টম ক্রুজকেও পাগল করে দেওয়ার সামর্থ্য রাখে। মেয়েটার টাইট স্কার্ট জানান দেয় মেদহীন শরীরের। কণ্ঠটা বেশ মোলায়েম, স্পষ্ট এবং ধীরগতির। শুনে অনুভবের হৃদয়ে প্রশান্তি বয়ে গেল। ক্ষমা চেয়ে অনুভব ইংরেজিতে জবাব দিল, 'দুঃখিত, আমি খুব দুঃখিত। আমি ল্যাটিন তেমন বুঝি না। আর এখানকার কেউ নই।'

মেয়েটাকে কিছুটা হতাশ মনে হলো। তাও মুখে হাসি এনে সে বলল, 'আমার নাম অ্যানেট। তুমি কোথা থেকে এসেছ?'

'আমি অনুভব। ইন্ডিয়া থেকে এখানে এসেছি। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য।' স্প্যানিশে জবাব দিল অনুভব। বার্সেলোনা পৌছানোর আগে খুব চেষ্টা করে কিছু স্প্যানিশ শব্দ শিখে নিয়েছিল সে কাজে লাগতে পারে ভেবে।

'তো আপনি এখানে নতুন?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটি।

'জি হ্যাঁ।' হেসে জবাব দিল অনুভব।

মেয়েটি বলল, 'আমিও এখানে নতুন। ভ্যালেন্সিয়া থেকে এসেছি। বার্সেলোনায় এই প্রথমবার।' বলেই অ্যানেট হাত গুটিয়ে সজোরে হাসতে লাগল। অনুভবও যোগ দিল সাথে।

দুপুরের খাবারের সময় ক্যাফেটেরিয়াতে অনুভব উদ্ভট সব কাজ করতে লাগল। আগাগোড়া গুলিয়ে ফেলল সব। ভুল কার্ড নিয়ে ঢুকে পড়ল ভুল কাউন্টারে। মেজাজ গরম হয়ে গেল তার। লজ্জায় শেষমেশ বেচারা না

খেয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিল। এক কোণায় সকালের সেই টাক মাথার ক্লাসটিচারকে সিটে বসে গ্রোগ্রাসে ইতালিয়ান রাইস ডিশ খেয়ে পেটপূজায় ব্যস্ত দেখতে পেল। তার সামনের চেয়ারটা খালি। অনুভব ভাবল সেখানে বসা যায়। কিন্তু ঠিক তখনই অ্যানেটের গলা শোনা গেল। মেয়েটা তাকে তার পাশে বসতে আহ্বান জানাচ্ছে। অনুভব ঠিক করল স্যারের কাছে না গিয়ে অ্যানেটের সাথে বসবে। অ্যানেট তাকে সালাদ দিতে চাইল। যদিও ততটা ক্ষুধা লাগেনি। তবু না করতে পারল না অনুভব।

পরেরদিন। ক্যাফেটেরিয়াতে কার্ডের ব্যবহার করতে অনুভবকে সাহায্য করল অ্যানেট। তাকে নিয়ে গেল বিশেষ এক কাউন্টারে যেখানে ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে ডিসকাউন্ট। তাছাড়া তাকে ভ্যালেন্সিয়ান রেসিপি শ্রিম্প পেলা রাইস খেতেও অফার করল অ্যানেট। একটু খেয়ে স্বাদ পাওয়ার পর অনুভব গ্রোগ্রাসে গিলতে লাগল, যেমনটা গতকাল তার স্যার করেছিল। বেশিরভাগ সময় অ্যানেট কথা বলেই পার করল। অনুভবকে সে তার বাবার কথা বলল যিনি কিনা একজন ফুটবলার ছিলেন। ভ্যালেন্সিয়ার অনুর্ধ্ব তিরিশ দলে খেলতেন। কিন্তু একসময় আঘাতের কারণে দল থেকে বাদ পড়েন। অ্যানেটের ইংরেজি বলার ধরন অত শুদ্ধ নয়, তবে তার চেষ্টার প্রশংসা করতে ভুল করল না অনুভব।

সন্ধ্যার দিকে তারা দুজন রাস্তায় হাঁটতে বেরোলো। তারপর রাতের খাবার খেল ক্যাফে এমাতে। এটা পুরোনো ধাঁচের একটা কফিশপ। ছোট গোলাকার টেবিলের দুই পাশে দুটো করে চেয়ার দিয়ে সাজানো। ডিম লাইট জ্বালানো ছিল। বাতাসে ভেসে আসছিল কফি আর পাস্ট্রিজের সুবাস।

অ্যানেটের পেটে যেন বহু কথা জমে ছিল। নানা বিষয়ে বলতে থাকল সে। এগুলোর বেশিরভাগই ভ্যালেন্সিয়া সম্পর্কে। সেখানকার ফুটবল ক্লাব, সমুদ্র সৈকত কোস্টা ব্লাঙ্কা, মালভারোসা ফুল এবং ফেলাস ফেস্টিভ্যাল নিয়ে কত কত কথা!

'আজ মাঝরাতে নিনোট পোড়াতে চলেছে সবাই। কি দারুণ ব্যাপার!' হাত ছোড়াছুড়ি করে বলল অ্যানেট।

'তুমি যাবে? মানুষের শোরগোল... ছোটাছুটি... ও খোদা! আমি তোমায় বলে বুঝাতে পারব না কতটা মজার উৎসব!'

অনুভব শূন্য দৃষ্টিতে অ্যানেটের দিকে তাকাল। তার উচ্ছ্বসিত চেহারার মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলল যেন। খাওয়া শেষে তারা বার্সেলোনার পরিচ্ছন্ন ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগল।

অ্যানেট স্মিত হেসে বলল, 'আমি খুব সাধারণ একটা মেয়ে। টাইট ড্রেস, বিলাসিতা... না বাবা, আমার এসব চাই না। সুন্দর একটা বিছানা, ভালো কিছু বই আর আমাকে জড়িয়ে থাকবে আমার প্রিয়তমের হাত... এসবই যথেষ্ট। আমি এসবই চাই। এর বাইরে হয়তো কিছু চকলেট এবং...

বার্সেলোনা থেকে রোমের লম্বা রাস্তা দিয়ে ভ্রমণ করতে চাই। অবশ্যই নিজস্ব জাহাজে চড়ে। আর জীবন ধারণের জন্য এক মিলিয়ন টাকা। এই যা!'

কথা শুনে অনুভব অ্যানেটের দিকে তাকাল। অ্যানেটও তাকিয়ে রইল অনুভবের দিকে। ভাবগম্ভীর অবস্থা। পরক্ষণেই দুজনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। এরপর বিনিময় হলো নিজেদের ইচ্ছাগুলোর। দুজনেই নীরবে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

'একটা বিষয় জানো অ্যানি? হাস্যোজ্জ্বল মুখ আমার একদম পছন্দ না।'

ভেঙচি কেটে বলল অনুভব। তারপর নিজের বুকে হাত রেখে গাম্ভীর্যের ভাব ধরে বলল, 'কিন্তু একটা ভাবগম্ভীর মুখ। আহা! আমার হৃদয় কাঁপিয়ে দেয়।' শুনে অ্যানেট অন্য দিকে তাকিয়ে রইল। বাতাসে তার চুলগুলো উড়তে লাগল।

মাঝরাত হয়ে এসেছে প্রায়। অ্যানেট গাড়ির খোঁজ করতে লাগল। একটা গাড়ি পেতেই দরজা খুলে গাড়িতে উঠল সে। গাড়িতে উঠার আগে তার ধৈর্যবান শ্রোতা অনুভবের গালে আলতো একটা চুমু দিল। এরপরের দিনগুলো থেকে এটা অনেকটা রুটিনে পরিণত হলো। কেবল, ক্যাফে এমার পরিবর্তে গ্যাব্রিয়েল তাপস রেস্তোরাঁ এবং চুমুর স্থায়িত্বে পরিবর্তন এল।

ছুটির দিনে তারা দুজন ম্যাজিক ফাউন্টেন নামে পরিচিত ম্যাজিকা ডি মজুটিকে ঘুরতে যেত। সেখানে যেতে প্রধান সড়ক এভ ডেল প্যারালাল ধরে এক মাইল রাস্তা দুজনে হেঁটে যেত। হাতে হাত রেখে তারা পথচারীদের মাঝে চলত এবং পর্যটকদের ভীড় পেরিয়ে বিশাল ঝর্ণার কাছে দাঁড়িয়ে উপভোগ করত।

ঝর্ণাটি বেশ সুন্দর। এর বিশেষত্ব হলো বাজনার তালে তালে ফোয়ারার রঙ পাল্টে যায়। কখনো লাল, কখনো নীল, কখনোবা হলুদ। রঙ বদলের সময় এক মুহূর্তের জন্য পানি নেমে যায়, ঠিক তার পরের মুহূর্তেই ভিন্ন বাজনার সাথে গগন ফুঁড়ে উপরে ওঠে। আবার নামে, আবার উপরে ওঠে। এভাবেই চলতে থাকে। যেন কোনো অদৃশ্য শক্তি এটা নিয়ন্ত্রণ করছে। পুরো বিষয়টা একেবারে জাদুকরী।

ফাউন্টেইনের সামনে একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা একে অপরকে জড়িয়ে আছে। এখানে সুলভমূল্যে বিয়ার কিনতে পাওয়া যায়। অ্যানেট ভাবল, এখানে এসে বিয়ার না খেলে চলে নাকি! দুই বোতল বিয়ার কিনল সে। নিজে এক বোতল রেখে অন্যটা অনুভবকে দিল। অবশ্য এর আগে অনুভব কখনোই অ্যালকোহল জাতীয় কিছু পান করেনি। ঝাঁজে ভরা ঠান্ডা তরল গলা দিয়ে নামতেই অ্যানেটের ইন্দ্রীয়গুলো নিজের অবস্থা জানান দিল। অনুভব রীতিমতো নাকানিচুবানি খেতে লাগল বিয়ারের বোতল নিয়ে।

কোনোমতেই এই তেঁতো তরল হজম করতে পারছে না। তাও চেষ্টা করে চলেছে। অ্যানেট নিজের বোতল শেষ করে আরো দুই বোতল বিয়ার নিয়ে এল। কিন্তু এসে যেই দেখল অনুভব খেতে পারছে না, সাথে সাথে বোতল দুটো ফেলে দিল।

অ্যালকোহল নিয়ে অদ্ভুত একটা বিষয় প্রচলিত আছে। কখনো আমরা অ্যালকোহল পান করি জীবনে ঘটে যাওয়া দুঃসহ কোনো বিষয়ের অনুভূতি থেকে মুক্তি পেতে। কখনোবা পান করি আনন্দের কোনো সংবাদ উদযাপন করার লক্ষ্যে। কখনো আবার কারণ ছাড়াই পান করি। অনুভব আর অ্যানেটের বিষয়টাও একইরকম। কারণ ছাড়াই পান করছে তারা। পুরো সন্ধ্যা হয়ে উঠল অ্যালকোহলময়। অ্যানেটের মাথা ঘুরাচ্ছিল। ক্ষণিকের ভেতর তার মনে হলো ফোয়ারাটা গায়েব হয়ে গেছে। মানুষের গুনগুন আওয়াজ ব্যতীত সমস্ত জায়গাটা নীরব। অ্যানেট চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে ফোয়ারা খোঁজার চেষ্টা করল, পেল না। কিন্তু অকস্মাৎ কোথাও সজোরে একটা আওয়াজ শোনা গেল... বুম...। তারপর আবার চলে গেল। পুনরায় আবার এমন হলো। পানির ফোয়ারা উঠতে লাগল উঁচু থেকে উঁচুতে। আনন্দে লাফিয়ে উঠল অ্যানেট। অনুভব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কাণ্ড দেখছিল। পেছন ঘুরে অনুভবের দিকে তাকাল সে। পরক্ষণেই একে অপরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। ওয়াটার জেট উঁচু থেকে উঁচুতে চলছে। বাজনার আওয়াজ বেড়ে চলেছে খুব জোড়ে। অ্যানেট অনুভবের আরো কাছে চলে এল। দেহের সাথে দেহ প্রায় লেগে আছে।

'আমাকে চুমু দিতে ভালো লাগবে তোমার?'

ফিসফিস আওয়াজে বলল অ্যানেট। অনুভব তার গরম নিঃশ্বাস শুনতে পাচ্ছিল। তার কানগুলো গরম হয়ে গিয়েছিল।

'কেবল কোনো পাগল ব্যক্তি এই প্রস্তাবে না করবে, বাকিরা সবাই ঠোঁট এগিয়ে দেবে।' জবাব দিল অনুভব। নিজের ভেতর উত্তেজনা বোধ করছে। আরো কাছে আসলো সে। নিচু হয়ে ঠোঁট বাড়িয়ে দিতেই দুজনের ঠোঁট একত্র হয়ে গেল। মুহূর্তেই গভীর হতে লাগল তা। একে অপরকে আঁকড়ে ধরল দুজন। অ্যানেটের হাত আঁকড়ে ধরল অনুভবের নিতম্ব। অনুভব আলতো করে ছুঁয়ে দিতে লাগল অ্যানেটের কোমড়। তাদের এই মধুর মুহূর্ত কতক্ষণ স্থায়ী হলো কে বলতে পারে! হঠাৎ অ্যানেট নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। বলল, 'আমি তৃষ্ণার্ত। আরেকটু ড্রিংকস করবে তুমি?'

'বিয়ারের কথা বলছ? কিন্তু এখন বিয়ার পাব কোথায়?'

ঘাড় বাঁকিয়ে চারপাশে তাকাল অনুভব। 'কোথাও তো দোকানিকে দেখতে...' কথার মাঝে তাকে থামিয়ে দিল অ্যানেট। দুষ্টু হাসি হেসে বলল, 'আমার ঘরের ফ্রিজে বিয়ার মজুদ আছে।'

'কিহ!' অ্যানেটের কথা শুনে অনুভবের চোখ কপালে উঠে গেল। দেখে অ্যানেট মুচকি হাসল।

খানিকবাদেই ক্যারির টেরাগোনার দিকে রওনা হলো তারা। সেখান থেকে বাসে উঠল। অনুভবকে জড়িয়ে রইল অ্যানেট। যাত্রাপথের পুরোটা সময় দুজনের মাঝে কোনো কথা হলো না। কেবল হৃদয়ে তুমুল ঝড় বইতে লাগল আকাঙ্ক্ষার কথা ভেবে।

আধঘন্টার ভেতরই তারা অ্যানেটের এপার্টমেন্টে পৌঁছে গেল। রুমটার সাজসজ্জা প্রায় অনুভবের রুমের মতোই, কিন্তু আকারে খানিকটা বড়। তাছাড়া সংযুক্ত বাথরুমও আছে। অ্যানেট বাথরুমে গেল। ঢোকার আগে বলল, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বেরুচ্ছে। কিন্তু এক মিনিটের মধ্যেই সে বাইরে বেরিয়ে এল। তাও প্রায় বিবস্ত্র রূপে। টেবিল থেকে কি যেন নিল। তারপর ফের বাথরুমে ঢোকার আগে অনুভবকে একটা উড়ন্ত চুমু খেল। অনুভব পানি খেয়ে নিল একটু। দুজনের একত্রিত হওয়ার মুহূর্ত মনে করে বুকে কাঁপন জাগল তার। মৃদু হেসে মনে মনে বলল, আজকেই সঠিক সময়।

বাতি নিভে যেতেই রাস্তার ল্যাম্প পোস্টের আবছা হলুদ আলোয় রুমটা আলোকিত হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ পর অ্যানেট একটা পাতলা কামিজ পরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসলো। দেখে অনুভব বিস্ময়ে হা করে তাকাল। লম্বা চুল অ্যানেটের পেছনের দিকটা ঢেকে ফেলেছে। অ্যানেটের এ রূপ অনুভবকে মাতাল করে তুলল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই অ্যানেট তার দেহের উপর ঢলে পড়ল। আলতো হাতে খুলতে লাগল তার শার্ট। উন্মুক্ত হতে লাগল অনুভবের শক্তপোক্ত বুক, বুকের উপর সরু পশমের লাইন নেমে গেছে নাভীর নিচ পর্যন্ত। অ্যানেটের লম্বা চুল বুকের উপর পড়তেই শিউরে উঠল অনুভব।

গরম নিঃশ্বাস নিতে লাগল অ্যানেট। ঝুঁকে পড়ল অনুভবের বুকে। তার মোলায়েম দেহে আলতো করে হাত বুলাতে লাগল অনুভব। এই মুহূর্তে অ্যানেটের ঠোঁট থেকে অনুভবের ঠোঁটের দুরত্ব এক ইঞ্চিরও কম। বাইরে গাড়ির হর্ন বাজল, পরক্ষণেই কয়েকটা বাইকের চলে যাওয়ার শব্দ। আর ভেতরে অ্যানেটের গরম নিঃশ্বাসের পুরোটাই অনুভবের মুখের উপর পরছে। অনুভব তার হাত অ্যানেটের বুকের ভেতর নেবে, অমনি অ্যানেট হাতটা সরিয়ে দিল। কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'তুমি তৈরি?' এক মুহূর্তের মধ্যে অনুভব তাকে জড়িয়ে নিল। আস্তে করে ঘুরিয়ে নিজে উপরে উঠল। ফিসফিস করে বলল, 'আজ দেখে নেব কতটা তৃষ্ণার্ত তুমি।'

তারপর সঙ্গম সুখে দুজন ভাসতে লাগল। ঐ রাতে অ্যানেট বহুবার এবং খুব বেশিই তৃষ্ণা অনুভব করেছিল।

সুমধুর সেই রাতের দুই সপ্তাহ পরের কথা। জোড়াপাখি মিলে কাতালোনিয়ার পবিত্র পাহাড় মন্টসেরাতে ঘুরতে গেল। সকালবেলা স্থানীয় আশ্রম ঘুরে ঘুরে দেখল ওরা। ছোট্ট বালকদের ছন্দময় কোরাস গানে মুগ্ধ হলো দুজনে।

বিকেলটা দুজনে হাঁটু সমান ঘাসের উপর দৌড়াদৌড়ি করে কাটাল। ইচ্ছে ছিল সমস্ত বিকেল গাছের ছায়ায় সবুজ ঘাসের উপর শুয়ে থাকবে, কিন্তু হলো না। অ্যানেট সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে দৌড়াতে লাগল। যেতে যেতে ঘাসের ডগায় তার হাতের তালুতে খোঁচা লাগল। যতবারই অনুভব তাকে ছুঁতে চেষ্টা করেছে ততবারই সে দৌড়ে পালিয়েছে। কেন পালিয়েছে জানে না সে। অনুভবের চোখের নেশাতুর দৃষ্টির দিকে তাকাতে খুব ভয় পাচ্ছিল অ্যানেট। অনুভব অবশ্য এতে কিছু মনে করেনি। সত্যি বলতে তার ভেতরেও কিছু অনুভূতি জাগছিল, যেসব থেকে মাঝেমধ্যে বিরত থাকলে দুজনের মাঝে দৃঢ়তা আরো অটুট হয়।

সূর্য উজ্জ্বল কিরণ দিচ্ছিল। বসন্তের বাতাস বইছিল চারিদিকে। তাদের পেছনেই বিশাল পর্বতমালা। পাখিরা গুনগুন করে গান গাইছিল। অনেকক্ষণ দৌড়ে অবশেষে অ্যানেটকে ধরে ফেলল অনুভব। বাহুতে জড়িয়ে সজোরে দোলাতে থাকল। অ্যানেট নীল আকাশে তাকিয়ে আছে। সুখের আভা ছড়িয়ে আছে তার চোখেমুখে। নিজেকে খুব হালকা মনে হলো তার। যেন কেউ তার ভেতরে হিলিয়াম গ্যাস পাম্প করেছে। হঠাৎই নিজের কাছে সব সাধারণ মনে হলো। মনে হলো সে জীবনের পরম সত্যের মুখোমুখি হয়েছে। যা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। এই অনুভূতিটা তার কাছে যেমনটা কুয়াশার মাঝে সাগর পাড়ি দেওয়া নাবিক অকস্মাৎ উজ্জ্বল দ্বীপের দেখা পায় তখন তার যেমন অনুভূতি হয় ঠিক তেমন।

অনুভব ধীরেসুস্থে তাকে মাটিতে নামাল। লম্বা ঘাস দুজনকে ঢেকে ফেলল যেইমাত্র ওরা মাটিতে শুয়ে পড়ল। আকাশে জমে থাকা মেঘ ক্ষণে ক্ষণে অনুভব ও অ্যানেটকে ছায়া দিতে লাগল। পাহাড়ের উপরে নিঃসঙ্গ একটি গাছের কারণে জ্বলজ্বলে সূর্যালোক কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। একে অপরের দিকে তাকাল ওরা। দুষ্টু ইঙ্গিত করে অ্যানেটকে চোখ মারল অনুভব। জবাবে মৃদু হাসল অ্যানেট। তারপর আর কোনো প্রস্তুতির দরকার হলো না... না দরকার হলো অনুমতি নেওয়ার। খুব কাছে আসলো একে অপরের। সবুজ তৃণভূমির মাঝে একে অপরের ঠোঁট এক করে দিল ওরা।

কিছুক্ষণ পর। অনুভব বোতল থেকে পানি খাচ্ছে। অ্যানেটকে এখনো ক্লান্ত দেখাচ্ছে। স্ফিত হেসে কাছে আসলো সে। দু'হাতে জড়িয়ে ধরল অনুভবকে। তারপর আলতো করে চুমু আঁকলো তার গালে। বলল, 'সেনজা ডি তে লা মিয়া ভিটা নন হা সেনসো।'

শুনে অনুভব হাসল। বলল, 'আমি স্প্যানিশও বেশি জানি না, সুইটি।'

'এটা ইতালিয়ান ভাষা, প্রিয়তম। মানে হচ্ছে, তুমিহীনা আমার জীবন অর্থহীন।'

এক মুহূর্তের জন্য দুজন দুজনের চোখে আঁটকে গেল। একে অপরকে জড়িয়ে চুমু খেতে লাগল।

***

পাঁচদিন পর। অ্যানেটের অ্যাপার্টমেন্টে দুপুরের খাবার খাচ্ছে অনুভব। অ্যানেট জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বিষণ্ন চেহারায় তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে।

'আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল... আগেই বোঝা উচিত...' বিড়বিড় করে বলতে লাগল অ্যানেট। তার মুখাবয়ব জ্বলে যাচ্ছে।

'আমি শুধু এটুকু বলছি, সবকিছু খুব দ্রুতই হয়ে যাচ্ছে। তাই ভয় করছে আমার।' আন্তরিকতার সাথে বলল অনুভব। চোখ ছলছল করছে তার।

অ্যানেট হাত ছোড়াছুড়ি করে কি যেন বলল। অনুভব তা বুঝতে পারল না। পরক্ষণেই মেয়েটা হতাশ দৃষ্টিতে রুমের চারপাশে তাকাতে লাগল। তার শরীর কেঁপে উঠছে, চেহারায় ভর করেছে তিক্ততা। বিষাদে চেহারা এমনভাবে কুঁচকে যাচ্ছে যেন তাকে শরীরের উপরে লাল পিঁপড়ার কামড় সইতে হচ্ছে। অনুভবের দিকে ফিরল সে, চোখেমুখে ভর করেছে একরাশ ঘৃণা।

'তোমার মনে হয় আমি একটা প্রস্টিটিউট! তাই না!' চিৎকার করে বলল অ্যানেট। দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে অনুভবের দিকে।

'অ্যানি, প্লিজ শান্ত হও। আমি শুধু এটুকু বলতে চাচ্ছি আমাদের একটু বিরতি নেওয়া দরকার এবং...' অ্যানেটের হাত ধরতে চেষ্টা করল অনুভব।

অ্যানেটের চোখে আগুনসম রাগ। দেখতে পাচ্ছে অনুভবের পাল্টে যাওয়ার সাথে সাথে কীভাবে তার ভালোবাসা জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। হৃদয়টা জ্বলে যাচ্ছে। তবুও শান্ত গলায় ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে বলল, 'তুমি আমাকে একজন প্রস্টিটিউট মনে করো যে কিনা একের পর এক খদ্দেরের সাথে শোয়? ছিঃ অনুভব, ছিঃ!' চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি ঝরতে লাগল তার। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল অ্যানেট। পরক্ষণেই নিজেকে শক্ত করল সে। চোখমুখ মুছে নিল। অনুভবের দিকে তাকিয়ে রাগী গলায় বলল, 'বেরোও। এক্ষুণি এখান থেকে বের হও।'

অনুভব হতবাক হয়ে গেল। 'অ্যানি...আমার কথা বুঝার চেষ্টা করো।'

'কিচ্ছু বুঝাতে হবে না। বেরোও বলছি। জাস্ট গেট লস্ট!' আর কিছু বলল না অনুভব। মাথা নিচু করে বের হয়ে গেল রুম থেকে।

আমরা যখন আকাশের দিকে তাকাই, মাঝেমধ্যে মেঘের বিভিন্ন আকৃতি দেখতে পাই। কখনো মেঘের মিল পাই খরগোশের সাথে, কখনোবা কুকুর ছানার সাথে, আবার কখনো হৃদয়ের আকৃতির সাথে। আর এটাই হচ্ছে বিশ্বাস তৈরি করার খেলা। জীবনটাও এমন। এখানে আমরা সবকিছুকে তেমন দেখতেই পছন্দ করি যেমনটা আমরা দেখতে চাই। অ্যানেট অনুভবকে তার সব দিয়েছে। যতটা সম্ভব দিতে পেরেছিল সে। তার সময়, সঙ্গ, দেহ এবং মন। সবকিছুই। অনুভবের মাঝে একজন রাজপুত্রের দেখা পেয়েছিল সে। কিন্তু অনুভব ছিল নিকষ কালো রঙের আকারবিহীন মেঘ– একটা দানব। নিচ তলায় যেতে যেতে অ্যানেটের আহাজারি শুনতে পাচ্ছিল অনুভব। সেই সন্ধ্যা হতে অনুভব নিজ জীবনের নতুন পথে যাত্রা শুরু করেছিল। নিজের স্বার্থ পূরণের পথে, যার প্রস্তুতি সে দু'সপ্তাহ আগেই নিয়েছিল। ঐ সন্ধ্যায়ই সৈকতে যায় সে। তার অপেক্ষায় ছিল ক্লাসের সেই গোলগাল দেখতে মেয়েটা। যাকে কলেজের প্রথম দিন অ্যানেটের পাশেই বসা দেখেছিল অনুভব। অন্ধকারাচ্ছন্ন বেলাভূমিতে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায় সে।

পরবর্তী তিন বছরে ক্লাসের হাফ ডজন মেয়ের সাথে ডেট করে অনুভব। তার অসাধারণ কুটিল বুদ্ধিমত্তা, দৈহিক সৌন্দর্য এবং মুখোশ পরিহিত মুখশ্রী দেখে কোনো মেয়ে না করতে পারত না। একের পর এক মেয়ের কাছে যেতে থাকে সে। পাপ-পূণ্য কোনোকিছুরই বিচার করে না। কিন্তু জগতে সবকিছুরই পরিবর্তন হয়। তার সকল কৌশলই একটা সময় এক মেয়ের কাছে এসে ব্যর্থ হয়। আর তার নাম হলো– ইশা।

অজানা কিছুর আভাস

নিজের রুমে পায়চারি করছিল আর্য। তারপর ধপাস করে বসে পড়ল সোফায়। গলা একেবারে শুকিয়ে গেছে তার। পানির গ্লাস নিতে টেবিলের কাছে যেতেই চোখ পড়ল দেওয়ালে টাঙানো পারিবারিক ছবিটার দিকে। পানি খেতে খেতে আর্য তাকিয়ে রইল নীল সাদা স্কুল ড্রেস পরিহিত হাতে পুতুল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মেয়ের দিকে। ছবি দেখে বলা মুশকিল কে বেশি সুখী, ইশা? নাকি তার দিকে এগিয়ে আসা তারই ছোট ভাই আর্য? এমনভাবে আর্য ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে যেন তার সুখী মুখটা সহ্য করতে পারছে না। কেনই বা পারবে? অবশেষে কেউ তার হাত ধরেছিল যে।

পানি গিলতে কষ্ট হচ্ছে আর্যের। যেন গলায় একটা পাথর আটকে গেছে। যতই পানি ঢালা হোক না কেন সেটা নিচে নামবে না। গ্লাসটা টেবিলে রাখল সে। চকচক করছে সেটা। পেট গুলিয়ে আসছে। প্রত্যেকটা নিঃশ্বাসে বুকে ব্যথা অনুভব করছে সে। লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে তাই সে উদ্ভট ভাবনা থেকে মুক্তি পেতে চাইল।

পৃথিবীতে দুটো বস্তু ভিতর থেকে ধ্বংস করে দিতে পারে- একটা হলো ঘুণপোকা, আরেকটা হলো স্মৃতি। আর্যের বুক কাঁপছে। অতীতের স্মৃতিগুলো ফ্ল্যাশব্যাকের মতো চোখে ভাসতে শুরু করেছে। ইশার দেওয়া চকলেট খাওয়া, পেয়ারা চুরির অপরাধে মোটাসোটা প্রতিবেশির ধাওয়া সবই মনে পড়ছে তার। মনে পড়ছে মায়ের মৃত্যুর পর তাদের দত্তক নেওয়া কুকুরের কথা, যেটাকে ইশা সাইকেলের উপর বসিয়ে ঘুরাত। এছাড়াও ইংরেজি শেখার প্রাথমিক সময়টা খুব মনে পরছে। তাদের আওয়াজ চারদিকে ভেসে যেত- এ ফর আপেল, বি ফর বল। স্মৃতিগুলো বাস করছে আর্যর মনে। সাদা-কালো ফ্রেমের মধ্যে। বাস্তবে সেসব ভেঙে শত টুকরো হয়ে গেছে।

ইংরেজিতে দুর্বল ছিল আর্য। তাই বাসায় একজন টিউটর রাখা হয়েছিল যাতে সে ভালো করে ইংরেজি শিখতে পারে। কিন্তু টিউটর লোকটা ছিলেন বদমেজাজি এবং স্কেল দিয়ে আর্যকে পেটাতে কার্পণ্য করতেন না। এ কারণে ওই শিক্ষকের উপর আর্য মোটেও সন্তুষ্ট ছিল না। তবুও সে তার জীবন পুনর্নির্মাণ করতে চেষ্টা করছিল। কেননা, উচ্চশিক্ষার জন্য ইশা বিদেশে চলে গিয়েছিল। চার বছর সে স্পেনে কাটায়। তারপর বাকি দু'বছর ব্যয় করে আমেরিকায়। মাতৃসুলভ বোনের চলে যাওয়াতে